সমুদ্র-দর্শন।

শ্রী শ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

হেমনগর, ময়মনসিং।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,

[illegible]বাজার, [illegible]নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট,

"তারা-প্রেসে"

শ্রীবিপিনবিহারী ইন্দ্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১৩২০ সাল।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

উৎসর্গপত্র

যিনি আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী, পরম শ্রদ্ধাস্পদ, পরম
পূজ্য—সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ ছিলেন ; যাঁহার অভাবে
আমার নয়ন ও মন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য ও
আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে ; যাঁহার অবিমিশ্র
ও অফুরন্ত স্নেহ-করুণার কথা স্মরণ করিলে এই
দীর্ঘকাল পরেও আমার অশ্রু-বিগলিত এবং
চিত্ত নিরতিশয় ব্যাকুল হয় ;—সেই
বৈকুণ্ঠবাসী পিতৃদেবের পূণ্য চরণো-
পান্তে আমার অনেক যত্ন, পরিশ্রম
ও আদরের বস্তু এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত
গভীর ভক্তিপূত-হৃদয়ে উৎসৃষ্ট
করিয়া চরিতার্থ
হইলাম।

শ্যামাকান্ত শর্ম্মা।

নিবেদন।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমার ভ্রমণ-কাহিনী জন-সমাজে প্রকাশিত হইতে চলিল। আমার এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গের জ্ঞাতব্য বিষয় তেমন কিছু না থাকিলেও বিদেশ ঘুরিয়া যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই; তাই এই প্রয়াস। আমার অক্ষম লেখনীতে পাঠকবর্গের প্রীতিকর একটী চিত্রও অঙ্কিত হইয়া থাকিলে আপনাকে ধন্য মনে করিব। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক এই পুস্তকের ভ্রম-প্রমাদ উপেক্ষা করিবেন।

বঙ্গভাষার সুপরিচিত স্বনামখ্যাত প্রতিভাশালী লেখক মাননীয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আশ্বাসবাক্যে এই দুরূহকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। অধিক কি, তাঁহার নিকট উৎসাহ না পাইলে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। এ জন্য আমি তাঁহার নিকট অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল করুন।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

আমি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। পুস্তক-লেখক অল্প বয়স্ক, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহার এই নবীন উদ্যম। বইখানি শুধু সাহিত্যিক স্পৃহা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নাই। আজকাল যাতায়াতের সুযোগ লাভ করিয়া অনেকেই ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন; পূজা-পার্ব্বণে যে ব্যয় হইত, তাহার অধিকাংশ এখন রেলওয়ে ও ষ্টীমার কোম্পানীর হাতে যাইয়া পড়িতেছে; পূজার ছুটিতে পূজাদর্শন ঘটে না, বিদেশ ভ্রমণ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় এই শ্রেণীর ভ্রমণবৃত্তান্ত ঘটিত পুস্তকের যতটা বাহুল্য হয় ততই মঙ্গল। গ্রন্থকার সেই প্রয়োজন অনুভব করিয়াই পুস্তকখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই পুস্তক নানাতত্ত্বের সমাবেশ হেতু ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু আমার মত বিদেশ-বিমুখ অপ্রবাসী ব্যক্তির পক্ষেও ইহা অনাবশ্যক নহে। যে সকল স্থান দর্শন আমাদের পক্ষে ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা অল্প, তাহা স্বপ্নে দেখিলেও ত ক্ষণিক সুখ হয়। আর যিনি নিজে তাহা দেখিয়াছেন, তিনি যদি সহৃদয়তার

সহিত তাহা বর্ণনা করেন, তবে আমাদের চক্ষুর পরিতৃপ্তি না হইলেও কর্ণ চরিতার্থ হইতে পারে। শ্যামাকান্ত বাবু আমাদিগকে তাঁহার ভ্রমণের গল্পটি সেইরূপ সরসভাবে শুনাইতেছেন। তিনি শুধু ভৌগলিক তালিকা এবং রেল ও একাগাড়ীর ভাড়ার ফর্দ্দ দিয়া যান নাই,—তিনি যে সকল স্থান দেখিয়াছেন, তাহাদের মাহাত্ম্য হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার লেখায় সেই বিচিত্রদৃশ্যদর্শনজনিত বিস্ময় ও প্রীতি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে,—হিমালয় দেখিয়া তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে ভগবানের গুণ গাহিয়াছেন, তীর্থস্থানে যাইয়া তিনি প্রত্নতাত্ত্বিকের ন্যায় উপলখণ্ড খুঁজিয়া বেড়ান নাই, তীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ১১৮ ও ১৪৪ পৃষ্ঠায় তিনি হিমালয়ের শোভা যে ভাবে অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা কবি ও চিত্রকরের যোগ্য। আমরা আনন্দ সহকারে পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি ও আনন্দের সহিত এই ক্ষুদ্র ভূমিকার দ্বারা ইহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি ১৩ ই আষাঢ়, ১৩২০ সন।

১৯, কাঁটাপুকুর লেন,
পোষ্ট বাগবাজার,
কলিকাতা। } শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

উত্তর-ভারত ভ্রমণ।

শোভার অনন্ত ভাণ্ডার, বিধাতার বিলাস-কানন—হিমাচল এবং ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শন করিবার বলবতী বাসনা আমার হৃদয়ে অনেক দিন যাবৎ জাগ্রত ছিল। প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বে কখনও সম্পূর্ণ সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই ; যেহেতু শুভকার্য্যে শত শত বিঘ্ন ঘটে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় এবার সেই চির বাঞ্ছিত সুযোগের সংঘটন হইল।

উত্তর-ভারত ভ্রমণ

কয়েক বৎসর অতীত হইল একটি যুবক সমভিব্যাহারে শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করিয়া আমি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। অতি দূরদেশে যাইতে হইবে বলিয়া ব্যবহারোপযোগী নিতান্ত প্রয়োজনীয় অল্পমাত্র জিনিস সঙ্গে লইলাম। "হক্" (Hawk) ষ্টীমার আমাদিগকে লইয়া যমুনা বক্ষে ভাসিল, এবং অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে অপরাহ্ণে "নগরবাড়ী" ষ্টেশনে উপনীত হইল।

নগরবাড়ীর সেটল্‌মেণ্ট সব ডিপুটী শ্রীযুক্ত বাবু সুধীর চন্দ্র ঘোষ "আড়ালিয়া" হইতে উঠিয়াছিলেন, এবং আমি যে ক্যাবিনে ছিলাম, সেই ক্যাবিনে আসিয়া স্থান লইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার সহিত ইত্যবসরে কিঞ্চিৎ পরিচয় হইল। সুধীর বাবুর বাড়ী চুঁচুড়া। তিনি অল্প দিন হইল পাবনা হইতে নগরবাড়ী বদলি হইয়াছেন। তিনি বেশ ভদ্র এবং বিনয়ী। এমন কি, তাঁহার পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে আমরা ডিপুটী অথবা কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারি নাই।

সুধীর বাবু এবং আমরা অপরাহ্ণে একটী বালুচরে অবতরণ করিলাম। সেই চরের সম্মুখে যমুনার একটী ক্ষুদ্র শাখা প্রবাহিত হইতেছে। ষ্টীমার হইতে নামিয়া

ঐ শাখা-নদী পার হইয়া নগরবাড়ী পৌঁছিতে হয়। বর্ষাকালে চর ডুবিয়া যায়; সুতরাং নগরবাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে ষ্টীমারের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু এ সময় চরে নামিয়া আরোহীদের বড় কষ্ট পাইতে হয়; কারণ পারাপারের সুবিধার জন্য কোনও খেয়া নৌকা নাই; অতএব নৌকা সংগ্রহ করিয়া পার হইতে হয়।

আমরা যমুনা-সৈকতে অবতরণ করিবার পূর্ব্ব হইতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমরা নামিয়া চরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এবং ঐ শাখানদী পার হইবার জন্য সুধীর বাবু অপর পারের মাঝিদিগকে আহ্বান করিতেছেন, এমন সময় প্রবল বেগে ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চরের উপর কয়েকখানা ভগ্ন নৌকা ছিল, আমরা নিরাশ্রয় তিনটী ব্যক্তি একটী নৌকার পার্শ্বে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু ইহাতে আমাদের কোন সুবিধা হইল না। অন্যূন এক ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আমরা বধ্য ভূমিস্থিত সদ্য স্নাত ছাগ-শিশুর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলাম।

ভয়ঙ্কর তুফানে এই ক্ষুদ্র তটিনীর ভয়াবহ তরঙ্গ ও উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত

হইলাম এবং মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, "করুণাময়, তোমার অকরণীয় কিছু নাই। তুমি নিমেষার্দ্ধে ক্ষুদ্রকে অতি বৃহৎ এবং বৃহৎকে অতি ক্ষুদ্রে পরিণত করিতে পার, এবং এই তটিনীর ন্যায় শত শত দৃষ্টান্ত আমাদিগকে উপদেশচ্ছলে সর্ব্বদা বিশ্বদর্পণে দেখাইতেছে ; কিন্তু অহংমদে মত্ত হইয়া আমরা তাহা দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না , বোধ হয় যেন কোন কালেই বুঝিব না।"

সুধীর বাবু প্রভৃত ক্ষমতা পরিচালন করা সত্ত্বেও তরঙ্গের ভিতর কেহই নৌকা লইয়া যাইতে সাহস করিল না।

অনেকক্ষণ পর ঝড় থামিল, প্রকৃতি হাসিল, বৃক্ষ শাখে পাখীগণ পাখা ঝাড়িল, পশ্চিমনীল-নভোমণ্ডলে অংশুমালীর রক্তিম-কিরণ-ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইল, এবং হিষ্টিরিয়াগ্রস্তা স্বজন-পরিবেষ্টিতা অবগুণ্ঠনবতী যেমন মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর সরমে অবগুণ্ঠন টানিয়া ঝটিতি কক্ষান্তরে প্রবেশ করে, সেইরূপ সলজ্জা তটিনীর উর্ম্মি-মালা আবেগভরে সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল!

"হুক্" এতক্ষণ ভয়ে মুহ্যমান হইয়া নোঙ্গর করিয়া যমুনাসৈকত সমীপে লুক্কায়িত ছিল, সে সময় বুঝিয়া বাষ্প উদ্গীরণ করিতে করিতে সগর্ব্বে গন্তব্য পথে

চলিয়া গেল। আমরাও পর পারে আসিয়া উপনীত হইলাম।

শাখা-নদীর তীরে সুধীর বাবুর আফিস্। তিনি আমাদিগকে সযত্নে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন এবং আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার বাসায় উপযুক্ত শয়ন-গৃহ না থাকায় তিনি তত্রত্য বাবু রজনীকান্ত দাসের পাটের আফিসে আমাদিগকে রাত্রিযাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সুধীর বাবুর বাসার অনতিদূরে রজনী বাবুর আফিস, এবং ঐ আফিসে সুধীর বাবুর কয়েকজন আফিসার আছেন; তিনি আমাদের আতিথ্য সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন; সুতরাং আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইল না।

নগরবাড়ী ধোঁপাখোলার নামান্তর মাত্র। ধোপা-খোলা একটি উন্নতিশীল গ্রাম। এই গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বাবু কৃষ্ণগোপাল ভট্টাচার্য্য স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। এ গ্রামে ন্যূনাধিক পাঁচশত ঘর লোকের বসতি আছে। বাসিন্দাগণ সকলেই ভদ্র এবং নম্র। গ্রাম্য সুখ-শান্তির জন্য মোটামুটি যাহা কিছু দরকার তাহা সমস্তই এ গ্রামে আছে। লতা পুষ্পসুশোভিত তৃণ-গুল্ম সমাচ্ছাদিত অসংখ্য

বৃক্ষরাজি-পরিবৃত নগরবাড়ীর দৃশ্য রমণীয়। এ প্রকার সুশীতল গাছছায়া-সন্নিবিষ্ট গ্রাম সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শাখানদী কুলু কুলুনাদে গ্রামের পাদমূল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ উষাকালে সুধীর বাবুর নিকটে বিদায় লইয়া গ্রাম্য পথে হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। আমার বড় আনন্দ বোধ হইল। আশৈশব আমি অসংস্কৃত গ্রাম্য পথে হাঁটিতে বড় ভালবাসি। যখন আমি কোন অপরিচিত জঙ্গলাকীর্ণ পথে বিচরণ করি তখনই আমার এ আনন্দ! অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন আমরা "স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রকৃতির অনন্ত-সৌন্দর্য্যে চিত্রিত চির-বৈচিত্র্যময় প্রিয় জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি এবং গ্রহ-বৈগুণ্যবশতঃ আমাদের অশ্বত্থ-বহুলা শস্য-শ্যামলা নদী-মেখলা নব-পল্লী ও বিশালোদরা যমুনা-রাক্ষসীর অঙ্কশায়িনী হইয়াছে; এখন আমরা বৃক্ষবিহীন এক মরু-গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছি; তাই অনেকদিন যাবত এ আনন্দ উপভোগে বঞ্চিত রহিয়াছি। আজ হঠাৎ সেই বনপথ পাইয়া এক প্রকার অভূত-পূর্ব্ব সুখ অনুভব করিলাম, এবং বহুদিন বিস্মৃত কৈশোরের ভ্রমণ-সুখ ক্রমে স্মৃতি-

পথে উদিত হইল। আমরা উৎফুল্ল-নেত্রে চিত্তোন্মাদিনী নৈসর্গিক গ্রাম্য-শোভা নিরীক্ষণ করিতে করিতে বিস্তর গ্রাম, উপবন, স্রোতস্বিনী ও প্রান্তর অতিক্রম করিয়া দ্বিযোজন পথ হাঁটিয়া চির-প্রসিদ্ধা মহা-বেগবতী পদ্মা নদীর তীরে খলিনপুর বা পরাণপুর নামক গ্রামে উপনীত হইলাম।

গ্যাঞ্জেশ-ডেস্‌প্যাচ্-সার্ভিস্ পূর্ব্বে "মীরপুর" ষ্টেশনে থামিত, এখন "খলিনপুর" থামিয়া থাকে। মীরপুর হইতে খলিনপুর বেশী দূর নহে। আমরা কিয়ৎকাল ষ্টীমারের জন্য অপেক্ষা করিয়াও অতিদূরে-নদী ও আকাশের সঙ্গমস্থলেবাষ্প দেখিতে পাইলাম না, এবং পরে অবগত হইলাম, এ লাইনের ষ্টীমার সর্ব্বদা নির্দ্ধারিত সময়ে আসে না, ও ঝড় বৃষ্টি হইলে কোন কোন দিন একেবারেই আসে না। ইহা শ্রুত হইয়া আমরা তথায় অনিশ্চিতভাবে বৃথা কাল বিলম্ব করা অনাবশ্যক বোধ করিলাম।

পদ্মা পার হইবার খেয়া নৌকা আছে। আমরা খেয়া নৌকায় উঠিলাম। নৌকায় উঠিয়া দেখি, নৌকার ভিতর একটী ছিদ্র হইতে অবিশ্রান্ত জল উঠিতেছে। নৌকায় ২৫।৩০ জন লোক উঠিল এবং নৌকাটী সম্পূর্ণ

বোঝাই হইল। ইত্যবসরে (নৌকা ছাড়িবার পূর্ব্বেই) নৌকার ভিতর চাহিয়া দেখি, নৌকার তলদেশ একেবারে জলপূর্ণ হইয়াছে।

একে পদ্মা নদী, তাহাতে আবার জীর্ণ তরী। শ্লীপদের উপর বিষব্রণ। সমস্তই আমাদের প্রতিকূল। আমরা বিপদ-তারণ শ্রীমধুসূদনের নাম স্মরণ করিয়া নৌকা ছাড়িলাম। আমার বিন্দুমাত্রও ভয় হইল না, অপিচ অভিজ্ঞতা আমাকে কতকটা সাহসী করিয়াছে, যেহেতু এ বিপদ আমার নূতন নহে।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে কলেজে অধ্যয়ন কালে সমুদ্র-বিহারের উদ্দেশে আমরা তিন বন্ধু মিলিয়া চট্টগ্রাম হইতে সামুদ্রিক ষ্টীমারে "কুতবদিয়া" গিয়াছিলাম। সে যাত্রা আমাদের যে অশিব সংঘটন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই পুস্তকের "সমুদ্র-দর্শন" প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, এ বিপদ নূতন নহে। বিখ্যাত পদ্মার তরঙ্গ কাহারও অবিদিত নাই। উর্ম্মিরাশি লোহার মুদ্গরের ন্যায় ধাক্কা মারিতেছে; বেচারা জীর্ণ তরণী কোন প্রকারে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেছে। আমরা অনেকক্ষণ এ দৃশ্য অবলোকন করিলাম। ক্রমে তরী তীরে পৌঁছিল। এই সময়ের

মধ্যে নৌকার অর্দ্ধেক জলমগ্ন হইয়াছে। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে এবারও রক্ষা পাইলাম।

আমরা বালুচরে নামিলাম। এখান হইতে গ্রামের দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল দিগন্ত-প্রসারিত বালুকা-রাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। দূরে—অতিদূরে—সীমান্তে ক্ষীণ কাল রেখা গ্রামের পরিচয় দিতেছে। আমরা বরাবর হাঁটিতে লাগিলাম। জন-মানবের চিহ্নও নাই। মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড ঝাউবন দেখা গেল, এবং তাহারই মধ্যে ক্বচিৎ কোন স্থানে দুই চারিটী "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ" ভীমকায় ব্যক্তি কাঁচি হস্তে জঙ্গল কাটিতেছে। ইহাদিগকে দেখিলেই পদ্মা তীরের দস্যু বলিয়া মনে হয়। শুনিলাম, রাত্রে কোন পথিক এখানে নামিলে পিতৃ-পুরুষের পুণ্যফল এবং পতিব্রতা রমণীর একমাত্র শাঁখা সিন্দূরের বলেই ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে। দিবাভাগেও একাকী এ স্থানে গমন করা সম্পূর্ণ আশঙ্কাজনক। সুবিধা পাইলে ইহারা কথনই আমাদিগকে ছাড়িত না। দৈববশাৎ আমরা নিস্কৃতি-লাভ করিলাম, এবং পাশাপাশি দুই মাইল হাঁটিয়া চর উত্তীর্ণ হইয়া লোকালয়ে আসিলাম। এখান হইতে

রেলওয়ে লাইন দিয়া পুনর্ব্বার তিন মাইল হাঁটিয়া ক্লান্ত দেহে, অবসন্ন মনে বেলা তিন ঘটিকার সময় ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের বিখ্যাত গোয়ালন্দ ষ্টেসন হইতে দশ মাইল দূরে "বেলগাছি" ষ্টেশনে উপনীত হইলাম।

সময় সঙ্কীর্ণ বিধায় বেলগাছিতে কিছু জলপান করিয়া রাণাঘাটের টিকিট লইয়া (2, down passenger) গাড়ীতে উঠিলাম। বেলগাছি হইতে রাণাঘাট ৯৪ মাইল। ভাড়া ১৶৯ পাই। ৪টা ১৩ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল।*

"পোড়াদহ জংসন" হইতে জনৈক প্রৌঢ়া ভদ্র মহিলা অষ্টম বর্ষীয় একটী বালক সমভিব্যহারে আমাদের গাড়ীতে উঠিলেন। দুই ষ্টেসন পর রমণী উদ্বিগ্নচিত্তে আমাকে বলিলেন—"বাবা, আমার সঙ্গে একটী আত্মীয় আসিয়াছেন, তিনি কোন্ গাড়ীতে আছেন তাহার সন্ধান পাইতেছি না, তুমি অনুসন্ধান করিয়া দাও।" আমি প্রত্যেক ষ্টেসনে নামিয়া তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এদিকে গাড়ী রাণাঘাট পৌঁছিবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করি-

* ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়ানুরূপ ধরা হইল।

লাম—"আপনি কোথায় যাইবেন?" তিনি উত্তর করিলেন "আমি কলিকাতায় যাইব"।

আমাদের গাড়ীতে একজন ভদ্রলোক কলিকাতায় যাইতেছেন। আমি তাঁহার হস্তে মহিলাকে সমর্পণ করিলাম এবং যাহাতে তিনি কলিকাতা পৌছিয়া এই রমণীকে অগ্রে তাঁহার বাসায় রাখিয়া পরে নিজের বাসায় গমন করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিলাম। নিরাশ্রয়া রমণীর জন্য কে না অগ্রসর হয়? ঐ ভদ্রলোক আমার কথামত কাজ করিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার হস্তে উক্ত মহিলাকে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম; তিনিও অতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন।

আমাদের গাড়ী রাত্রি ৯টা ১০ মিনিটে রাণাঘাট আসিলে আমরা মহিলার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ষ্টেসনে নামিলাম। ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ে কোম্পানী কয়েক মাস হইল গোদাগারি হইতে কাটিহার পর্য্যন্ত এক নূতন লাইন খুলিয়াছেন। রাণাঘাট হইতে এ লাইনে কাটিহার যাওয়া মনস্থ করিয়া সিয়ালদহের ট্রেণের প্রতীক্ষায় বিশ্রাম-গৃহে অতি কষ্টে দীর্ঘ তিন ঘণ্টা অতিবাহিত করিলাম। গাড়ী আসিলে টিকেট লইয়া

(41, up daily mixed) ট্রেণে রাত্রি ১২টা ১০ মিনিটে রাণাঘাট হইতে রওনা হইলাম। রাণাঘাট হইতে কাটিহার ২১৫ মাইল; ভাড়া ১৷৶ আনা।

আমরা রাত্রিকালে ক্রমান্বয়ে ১টা ৮ মিনিটে নদীয়া-জেলার প্রধান নগর কৃষ্ণনগর, ৩টা ৮ মিনিটে বিখ্যাত পলাশী ক্ষেত্র ও ৪ টা ৪৬ মিনিটে মুর্শিদাবাদের সদর ষ্টেসন বহরমপুর দেখিতে পাইলাম। এ সকল ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করিয়া অতীত স্মৃতিতে আমার চিত্ত মথিত হইল। কোথায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং কোথায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা! সর্ব্ববিধ্বংসী কাল মুহূর্ত্তে সকলকে গ্রাস করিয়াছে। গৌড় ও নদীয়া এককালে হিন্দুরাজা-দিগের এবং ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ মুসলমান বাদসাহদিগের রাজধানী ছিল। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার রাজধানী মুসলমানের হস্তগত হয়।

পলাশী একটী বিশাল প্রান্তর। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও দুই একটী বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। পলাশী দেখিয়া কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের প্রথম কাব্য "পলাশী যুদ্ধের" ওজ-স্বিনী-ভাষা মনে পড়িল। যেখানে এক দিন কামানের গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়াছিল, যেখানে বন্দুকের ধূমে

গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন ছিল, যে স্থানে ইংরাজ ও নবাব সেনানীর পদভরে মেদিনী কম্পিতা হইয়াছিলেন, এবং যে যুদ্ধক্ষেত্রে দীর্ঘকাল দিবাভাগেও কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই, কালের কুটীল-চক্রে আজ তাহা শান্তি-নিকেতন হইয়াছে। আজ সেই ভীষণ সমর ক্ষেত্রে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইলে শাখাসীন পাখীগণের সুমধুর সঙ্গীতে প্রাণ শীতল হয়। প্রিয় পাঠক, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন কি অভাবনীয় ব্যাপার! মাত্র দেড় শতাব্দীর পর কি ঘোর পরিবর্ত্তন! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে একটী ঘটনার উল্লেখ করা গেল।

কলেজের ছুটির সময় আমি একটী বন্ধুসহকারে ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ রামপাল গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এই রামপাল একদা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। কৌলিন্য-সংস্থাপক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লাল সেন এই রামপালে বাস করিতেন। প্রাচীন ইষ্টকের স্তূপ, শুষ্ক সরোবর প্রভৃতি আজও ভগ্ন-হৃদয়ে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। জনশ্রুতি এই,—বৃদ্ধা রাজমাতা যতদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তত দূর পর্য্যন্ত এক সুবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করা হইয়াছে। ইহাকে এখনও লোকে “বল্লাল-দীঘি” বলে। এই

দীঘি খনন করিয়া কুলিরা প্রতিদিন কার্য্য শেষে একটী স্থান হইতে প্রত্যেকে এক কোদাল মাটি কাটিয়া পরে কোদাল ধৌত করিত, এইরূপে যে দীঘির সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা "কোদাল ধোয়ার দীঘি" বলিয়া প্রসিদ্ধ। কালক্রমে মুসলমানগণ রাজধানী আক্রমণ করিলে সতী কন্যারা অনন্যোপায় হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন, এই অগ্নিকুণ্ড "মিঠাপুকুর" নামে খ্যাত। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা এখনও সেই স্থান দেখাইয়া থাকে। বল্লালের পূর্ব্বপুরুষ অপুত্রক রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রের পাঁচ জন অদ্ভুত শক্তিশালী বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহারা রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য জলগণ্ডূষ হস্তে সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। যথা সময়ে রাজার নিকট সংবাদ গেল। কিন্তু মহারাজ আদিশূর এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধৃবেশে আগমন করায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। তেজঃ-পুঞ্জ ঋষিগণ ইহা বুঝিতে পারিয়া সমীপস্থ শুষ্ক গজারি বৃক্ষে আশীর্ব্বাদ-বারি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন। আশী-র্ব্বাদের অমোঘ শক্তিবলে মৃত বৃক্ষ বাঁচিয়া উঠিল এবং নবপত্রে সুশোভিত হইল। ঐ গজারি বৃক্ষ অতীত ঘটনার

সাক্ষীস্বরূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কিম্বদন্তী এই, ঐ বৃক্ষে রাজহস্তী বন্ধন করা হইত। ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু-রমণীগণ এখনও বৃক্ষ মূলে তৈল ও সিন্দূর অনুলেপন করিয়া থাকে।

রামপালের কৃষকগণ ভূমিকর্ষণকালে অনেকে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান জিনিষ পাইয়াছে এবং এখনও সময় সময় পাইয়া থাকে। যেখানে রাজ-দরবার হইত, ঠিক সেই স্থান এখন ইক্ষুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই ক্ষেত্রে জম্বুকও দেখিলাম। কি আশ্চর্য্য! কালের কি অসাধারণ শক্তি! এই লোমহর্ষণ দৃশ্যে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় আমার মর্ম্মস্থান বিদ্ধ হইল। যে দরবারে একটী মক্ষিকা প্রবেশ করিতে সঙ্কুচিত হইত, আজ সেই দরবারে জম্বুক দিবাভাগে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে—দরবার-গৃহ ভেদ করিয়া ইক্ষুদণ্ডগুলি বিপক্ষ সেনাণীর ন্যায় সদর্পে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে। ইহা চিন্তা করিতেও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। নিষ্ঠুর বিধাতঃ! এ তোমার কেমন লীলা!

৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে ৬টা ৩৭ মিনিটে লালগোলা-ঘাটে গাড়ী থামিল। লালগোলাঘাট হইতে পদ্মা পার

হইয়া গোদাগারিঘাটে যাইতে হয়। পারাপারের জন্য "অপ্রে" ষ্টীমার আছে। আমরা পদ্মায় স্নান করিয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। "অপ্রে" লালগোলাঘাট হইতে ৭টা ৩৬ মিনিটে ছাড়িয়া ৮টা ২৬ মিনিটে গোদাগারি ঘাটে গেল। ষ্টীমার হইতে নামিয়া আমরা ষ্টেসনাভিমুখে যাইতেছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক একটী বৃদ্ধা পরিচারিকাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন "আপনি কাটিহার যাইবেন, এ বৃদ্ধাও কাটিহার হইয়া ইহার প্রভুর নিকট ভাগলপুর যাইবে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাকে কাটিহার পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইবেন।" আমি বৃদ্ধাকে অভয়দান করিয়া তাহাকে আমার গাড়ীতে উঠাইলাম। বৃদ্ধা আমাকে পাইয়া বড় আনন্দিতা হইল। তাহার ব্যবহারে বোধ হইল যেন আমি তাহার চির-পরিচিত। বিদেশে এ প্রকারই ঘটিয়া থাকে। কাহারও দ্বারা সামান্য উপকার পাইলে তাহাকে পরম বন্ধু বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ, বিদেশে বন্ধুর অভাব হয় না। ইহা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। সহস্র মাইল দূরের অজ্ঞাত কুল শীল ব্যক্তির সহিত এমন গাঢ়-প্রণয় জন্মে যে, তাহা চিন্তা করিলে ভগবানের করুণায় হৃদয় আপ্লুত হয়। জলপথে ও স্থলপথে সর্ব্বদা এরূপ বান্ধব

না মিলিলে কেহ একাকী ঘরের বাহির হইতে পারিত না। পাঠক! জগদীশ্বরের প্রতি আস্থা রাখিয়া ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে যেখানেই কেন পরিভ্রমণ করুন না, কখনও সুহৃদ্‌বিহীন হইবেন না। আমারও অনেক মিত্র লাভ হইয়াছে, এবং অনেকের দ্বারা আমি এতদূর উপকৃত হইয়ছি যে, তাঁহাদের কথা প্রস্তরফলকে খোদিত লিপির ন্যায় চিরদিন হৃদয়ে অঙ্কিত রহিবে।

(41, up mixed daily) ট্রেন ৮টা ৪৬মিনিটে ছাড়িল। নূতন লাইন বলিয়া গাড়ী ঘণ্টায় কুড়ি মাইলের কম চলে, এবং প্রত্যেক ষ্টেসনে প্যাসেঞ্জার না থাকিলেও অনর্থক দশ বার মিনিটের অধিক অপেক্ষা করে। ইহাতে বড়ই উদ্বেগ বোধ হইল। বেলা ১টা ২১ মিনিটে মালদহ জেলার প্রধান নগর ইংরেজ-বাজারে গাড়ী থামিল। মালদহ ইতঃপূর্ব্বে ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত ছিল; বঙ্গ-বিচ্ছেদের পর ইহা রাজসাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখানে আসিলে রাজা আদিশূরের রাজধানী প্রাচীন গৌড় নগরের কথা আমার স্মরণ হইল। মালদহ হইতে আট দশ মাইল দক্ষিণে গৌড়ের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। মহারাজ আদিশূরের বংশধর রাজা বল্লালসেন ও তৎপুত্র

রাজা লক্ষ্মণ সেন ধরাতল হইতে কবে অপসৃত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত কৌলিন্য-প্রথা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এ পৃথিবীতে সকলেই এইরূপ চলিয়া যায়, এবং সকলকেই এই স্বর্গোপম মাতৃভূমি ত্যাগ করিতে হইবে। তবে ভরসা এই—কেহ চলিয়া গেলে তাহার সহিত সমস্ত মুছিয়া যায় না। নদী শুষ্ক হয় বটে, কিন্তু রেখা থাকে। মানুষ মরিয়াও স্বীয় গুণানুসারে অল্পকাল বা দীর্ঘকালের নিমিত্ত ইহসংসারে জীবিত থাকে, এবং অমর ইতিহাস তাহা মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করে।

মালদহের আম্র কানন একটী অপূর্ব্ব দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, আম্র কানন ভিন্ন দ্বিতীয় বৃক্ষ দেখা যায় না। এমন আম্র কানন সমাকীর্ণ জেলা ভারতে বিরল। আমাদের দেশে জ্যৈষ্ঠমাসে আম্রফলের সুপক্কাবস্থা; কিন্তু এখানে মাত্র অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে। যেখানে এত বৃক্ষ জন্মে, তাহার ফল ভারত ব্যাপী হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? আম্র ফলের রাজা। সেই শ্রেষ্ঠ ফল ঈশ্বর আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলে ভগবানের অপার করুণার কথাই মনে হয়।

রেলওয়ে আইনের সাধারণ নিয়মানুসারে প্রতি ১০০ মাইল পরে নামিয়া একদিন বিশ্রাম করিতে পারা যায়;

কিন্তু এই নূতন লাইনে সে সুবিধা নাই বলিয়া এ পথে বাঙ্গালী খুব কম যাতায়াত করে। এ লাইনে ভাড়া খুব কম। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম, কুলিদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভাড়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যুক্ত-প্রদেশের অধিকাংশ কুলি এই লাইনে যায়। "লালগোলাঘাট" পর্য্যন্ত অনেক বাঙ্গালী ছিল, তাহার পর তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। মালদহ ছাড়াইলে বাঙ্গালী বড় দেখি নাই।

আমরা ৫টা ৫২ মিনিটে কাটিহার অবতরণ করিলাম। কাটিহার বড় জংসন। ইষ্টারন্-বেঙ্গল-ষ্টেট-রেলওয়ের এক শাখা গোহাটী হইতে ও অন্য শাখা গোদাগারি-হইতে আসিয়া এখানে বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্টারন্-রেল-ওয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টারন্ রেলওয়ে লাইনের বিস্তার ১৪০০ মাইল। আমরা বৃদ্ধাকে একটী নিরাপদ স্থানে আনিয়া রাখিলাম। সে ইহাতে পরম সন্তোষলাভ করিল। তাহাকে আর কোন সাহায্য করিবার আবশ্যক হইবে না এবং সে এখন আপনিই ভাগলপুর যাইতে পারিবে, ইহা বলিয়া আমাদিগের নিকট সুমিষ্ট বচনে বিদায় লইল। দুই দিবসের অনশনে আমরা অবসন্ন-হৃদয়ে ম্লান-মুখে জঠর জ্বালা নিবৃত্তির চেষ্টায় খাদ্যান্বেষণে বহির্গত হইলাম।

উত্তর ভারত ভ্রমণ

উদরের চিন্তা বড় চিন্তা। ইহা অপেক্ষা অধিক ভাবনার বিষয় এ জগতে নাই। তাই বুঝি শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"পৃথিব্যাং যানি ভূতানি জিহ্বোপস্থ নিমিত্তকম্।
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাং কিং প্রয়োজনম্॥"

কাটিহার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত। এখানে যে কয়জন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা সকলেই আফিসের কর্ম্মচারী। এতদ্ভিন্ন এখানে কোন বাঙ্গালীর ভদ্রাসন নাই। এ স্থানের অধিবাসীরা হিন্দুস্থানী। বেঙ্গল-নর্থ ওয়েষ্টারন্-রেলওয়ে কাটিহার হইতে কাণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এ লাইনে মিটার গেজের মাপ, ও ইহার রেল তিন ফুট ৩$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি প্রশস্ত।

রাত্রে আহারান্তে টিকিট করিতে গেলাম। কার সাধ্য টিকিট-গৃহে প্রবেশ করে? ভীম পরাক্রম হিন্দুস্থানীগণ যমদণ্ড হস্তে টিকিট-গৃহ বেষ্টন করিয়া আছে। প্রথমতঃ দুই একবার অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে অতিকষ্টে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে দুইখানা লক্ষ্ণৌর টিকেট লইয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পাঠক! অকপট-চিত্তে লিখিতেছি, দুর্ব্বল, হীনবীর্য্য বাঙ্গালী-জীবনে শতবার ধিক্কার আসিল। প্রত্যুত

বিদেশে শারীরিক শক্তি প্রধান অবলম্বন। যাহার সে শক্তি নাই, তাহার বিদেশ গমন বিড়ম্বনা মাত্র।

এ অঞ্চলে টিকেট করিতে এতটা বেগ পাইতে হইবে জানিয়া আমরা একেবারে লক্ষ্ণৌর টিকেট লইলাম, এবং ভবিষ্যতে আর কখনও অনতি দূরবর্ত্তী স্থানের টিকেট লই নাই। কাটিহার হইতে লক্ষ্ণৌ ৪৮০ মাইল, ভাড়া ৩৸৶০।

কাটিহার হইতে বেঙ্গল নর্থ-ওয়েষ্টারন্-রেলওয়ের গাড়ীতে উঠাও বড় কষ্ট। এক প্রকার মারামারি করিয়া সবলে উঠিতে হয়; কারণ নাগ্‌রা জুতা পায়ে গাঁটরি কক্ষে, তৈলপূর্ণ বংশদণ্ড হস্তে উষ্ণীষধারী ভোজপুরী-গণ প্রত্যেক কামরা অধিকার করিয়া আছে। উঠিবার অসুবিধা হওয়ায় মধ্য-শ্রেণীর টিকেট লইতে গেলাম। আমাকে দেখিয়া প্রিয় কেরাণী বাবু পর্ণ পত্র চিবাইতে চিবাইতে বাতায়ণ্ কক্ষ ঝটিতি বন্ধ করিলেন, অমনি যুগপৎ ঘণ্টা বাজিল। আমরা দৌড়িয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ১০টা ৪০ মিনিটে (1, up passenger ট্রেণ চলিল।

এই ট্রেণে একটীও বাঙ্গালী নাই, এবং কাটিহার ত্যাগের পর শীঘ্র আর কোথাও বাঙ্গালী দেখি নাই। বাঙ্গালীর অভাবে আমার হৃদয়ে একটু

অশান্তির উদ্রেক হইল। বাঙ্গালীর অভাব আমি বিশেষরূপে অনুভব করিলাম। এরূপ মনোবেদনা অস্বাভাবিক নহে। তবে সুখ এই, এ যাতনা আমার অধিক দিন ছিল না। কারণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে সমস্ত সহ্য হয়। অদ্য যাহা কঠিন বোধ হইতেছে, অভ্যাস বলে কল্য তাহা সহজ হইয়া আসিবে, ইহা প্রকৃতি-সিদ্ধ। বাঙ্গালীর অদর্শন ও বঙ্গভাষায় কথা কহিতে না পারিয়া যে ক্লেশ অনুভব করিতেছি, ক্রমে তাহা সহ্য হইয়াছিল।

আমি হিন্দি ভাষা ভাল রকম কহিতে পারি না বটে, কিন্তু সাধারণ ভাবে কথোপকথন করিতে বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করি না; পরন্তু বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। কারণ সমস্ত ভাষাতেই অপরের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে যে সময় লাগে, নিজে বলিতে ও শিক্ষা করিতে তদপেক্ষা অধিক সময় সাপেক্ষ। আমাকে একটী হিন্দুস্থানী ভৃত্য দ্বাদশবর্ষ সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। সে আর ইহ-সংসারে নাই। তাহার অভাব আমার নিকট বন্ধু-বিয়োগ অপেক্ষা অধিক। সে আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। আমি তাহার ক্রোড়ে আবাল্য বর্দ্ধিত। আমার এই তেত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যে তাহার

ন্যায় স্নেহশীল, সরল, বিশ্বাসী ও প্রভুভক্ত ভৃত্য আর দেখি নাই। তাহার নিকট সর্ব্বদা হিন্দিভাষা শ্রুত হওয়ায় সে ভাষা অপরিচিত নহে। অপিচ, তাহার মুখ-নিঃসৃত দুই চারিটী শব্দ এখনও বেশ স্মরণ আছে; কারণ শৈশবের কথা বড় স্মরণ থাকে। হিন্দুস্থানী লোকের সহিত এখন যে কিছু কথাবার্ত্তা কহিতে পারি, ইহা সেই অঙ্কুরিত বীজের ফল, এ কথা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য।

আমাদের গাড়ীতে বিহার-নিবাসী একজন আদালতের কর্ম্মচারীর সহিত আমার পরিচয় হয়। ইনি সুশীল ও মিষ্টভাষী। কথা বলিবার শক্তি সকলের সমান নহে। বাক্য স্ফুরণ সকলের সমান হয় না। ইহা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির উপর নির্ভর করে না। ইহা ঐশ্বরিক শক্তি বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল। ইহাঁর কথায় লালিত্য আছে। ইহাঁর শব্দ চাতুর্য্যে ও বাক্য বিন্যাসে আমি মুগ্ধ হইলাম। ইহাঁর নিকট অনেক নূতন কথা শুনা গেল। এই মহা গ্রীষ্মে ছাপরা, গোরক-পুর প্রভৃতি জেলা অতিক্রম করিতে বড় কষ্ট হইবে বলিয়া ইঁনি আমাদিগকে প্রত্যহ দিবাভাগে বিশ্রাম করিয়া রাত্রিকালে যাতায়াত করিতে উপদেশ দিলেন এবং

কাটিহার হইতে লক্ষ্ণৌর মধ্যে (এই লাইনে) ছাপরা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে আহারাদি করার বিশেষ সুবিধা নাই বলিয়া ছাপরা নামিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। নানা কারণে আমরা ইঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

আমরা রাত্রি ১।৩৪ মিনিটের সময় কাটিহার হইতে ৪৫ মাইল দূরে "থানা-বিহিপুর" ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। কাটিহার এবং থানা-বিহিপুরের মধ্যে কোশী নদীর পুল পার হইলাম। থানা-বিহিপুর হইতে গঙ্গা-তীরে "ভাগলপুর-কাছারী" একটী শাখা-লাইন গিয়াছে। থানা-বিহিপুর হইতে রওনা হইয়া ৪।৪৫ মিনিটে "সাহেবপুর-কমল" পৌঁছিলাম। সাহেবপুর-কমল হইতে "মুঙ্গের ঘাট" পর্য্যন্ত একটী ব্রাঞ্চ ট্রেণ আছে। সাহেবপুর-কমল হইতে রওনা হইয়া ৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে ৬।৩৮ মিনিটে "বারাউনি-জংসনে" উপস্থিত হইলাম। বারাউনি একটী বড় জংশন। এখান হইতে এক শাখা "সমস্তিপুর" জংশন হইয়া দ্বারবঙ্গ ও মুজাফরপুর, এবং অন্য শাখা সিমারিয়াঘাট গিয়াছে। ইহার অপর পার "মোকামা-ঘাট"। এখানে গাড়ী প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে। আমরা ইত্যবসরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম।

পানিওয়ালা দন্তকাষ্ঠ ও জল লইয়া বারংবার উচ্চৈঃ-স্বরে আহ্বান করিয়া ট্রেণের একপ্রান্ত হইতে অপর-প্রান্তে যাইতেছে, এবং আরোহীদিগকে জল ও দন্তকাষ্ঠ দিয়া পুরস্কারস্বরূপ একটী পয়সা চাহিয়া নিতেছে।

আমরা বারাউনি জংশন হইতে ১০।৬ মিনিটে "হাজি-পুর" আসিলাম। একই শব্দের বা পদার্থের স্থানভেদে নামভেদ হইয়া থাকে। দুই বা ততোধিক থানার শাসনাধীন যে স্থান, বঙ্গদেশে তাহা "মহকুমা",—বিহার, যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাবে তাহা "তহসিল" এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তাহা "তালুক" নামে অভি-হিত হয়। হাজিপুর মুজাফরপুর জেলার তহসিল।

আমরা হাজিপুর ছাড়াইয়া প্রাচীন-স্মৃতি-বিজড়িতা প্রসিদ্ধা গণ্ডকী নদী পার হইয়া পরবর্ত্তী ষ্টেসন "সোনপুর" আসিলাম। সোনপুর সারণ জেলার অন্তর্গত। এখানে গঙ্গা নদী পার হইয়া "দিঘাঘাট" যাওয়া যায়। সোনপুর হইতে মুজাফরপুর পর্য্যন্ত এক শাখা-লাইন গিয়াছে। ইহার সন্নিকটে বিখ্যাত হরিহর ছত্র। প্রতি বৎসর রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে সাত আট মাইল ব্যাপিয়া হরিহর ছত্রে প্রকাণ্ড মেলা বসে। ইহাকে সোনপুরের মেলা কহে। এই মেলা প্রায় একমাস থাকে। মেলার স্থানটী রম-

নীয়। মেলার সময় ভারতের নানাস্থান হইতে হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এত বড় বৃহৎ মেলা ভারতে আর নাই। আমরা মেলার স্থান দর্শন করিতে করিতে চলিলাম, এবং ১১।৫৪ মিনিটে বিহারের অন্তর্গত "ছাপরা" ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। এই জংসন হইতে বালিয়া ও গাজিপুর হইয়া বানারস পর্য্যন্ত এক শাখা লাইন গিয়াছে। কাটিহার হইতে ছাপরা ১৯৯ মাইল। ইহা সারণ জেলার প্রধান নগর। হাজিপুর হইতে বেশ গরম বোধ হইতেছিল, ছাপরা আসিয়া আর দুদণ্ড স্থির থাকিতে পারিতেছি না। একি বিপদ! ট্রেণ যখন বেগে চলে তখন তীব্র উষ্ণ বায়ু-প্রবাহ সংস্পর্শে শরীর দগ্ধ হয়, এবং যখন কোন ষ্টেসনে অপেক্ষা করে তখন মহা গ্রীষ্ম বোধ হয়। ভাবিলাম "দয়াময়, এই উত্তপ্ত-বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া আমাদিগকে কোন্ দেশে কি উদ্দেশ্যে লইয়া চলিয়াছ তাহা একমাত্র তুমিই জান। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই, মানুষের ভাবনা বৃথা।" পরম্পর শ্রুত হইলাম, এ দেশের ভদ্রসম্প্রদায় বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে দিনে রেলপথে যাতায়াত করেন না। বেলা বৃদ্ধির সহিত গরম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। স্থানীয় লোকেরই এ গরম অসহ্

হয়; পরিমিত শীতাতপ-পুষ্ট বাঙ্গালী-দেহে অকস্মাৎ নূতন প্রদেশের ভীষণ গরম অসহনীয় হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? একমাত্র সান্ত্বনা এই, দুঃখের অবস্থা সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না। অতি দুঃখের সময় দয়াময় মাঝে মাঝে শান্তি-বারি সিঞ্চন করেন। তাহা না হইলে বিধাতার সৃজিত সোণার সংসার ছারখার হইত—পৃথিবী মহা-শ্মশানে পরিণত হইত। আমাদের কষ্ট দেখিয়া স্বভাবতঃ উদারচিত্ত হিন্দুস্থানীরা কেহ সহানুভূতি-সূচক আলাপনে আপ্যায়িত করিল, কেহ জল আনিয়া দিল, কেহ বাতাস করিতে আসিল, যেন আমরা তাহাদের পরমাত্মীয়। তাহাদের এরূপ সৌজন্যে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম। বস্তুতঃ তাহারা প্রশংসার্হ। তাহাদের পরিচর্য্যায় আমাদিগের সকল কষ্ট তিরোহিত হইল।

বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালীকে সকলেই আদর করে, সকলেই ভালবাসে। বাঙ্গালীর সংসর্গে তাহারা নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে, ও বাঙ্গালীর জন্য তাহারা ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। পাঠক! মনে করিবেন না, বাঙ্গালীরা হিন্দুস্থানীদের অপেক্ষা কোন কোন অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া

তাহারা বাঙ্গালীকে সম্মান করে। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, ইহা লৌহের শক্তি নহে, চুম্বকের গুণ বাঙ্গালীর দোষ ও গুণ বাঙ্গালীর অবিদিত নাই। সুধী পাঠক! অন্তর্দ্দৃষ্টি করিয়া নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন কি, বাঙ্গালীর নৈতিক জীবন ভারতের কোন জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এ বিষয়ে হিন্দুস্থানীগণ আদর্শ। তাহারা সত্যবাদী, ধর্ম্মভীরু এবং চরিত্রবান্। সময় সময় তাহাদের ভিতর যে বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় পাওয়া যায়, ইহার কারণ, তাহাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের অভাব। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহারা ভারতের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিতে পারে।

আমরা ১।১৬ মিনিটে "দারোগা" জংসনে উপনীত হইলাম। এখান হইতে একটী শাখা লাইন "মহারাজ-গঞ্জ" গিয়াছে। দারোগার এক ষ্টেসন পরে "সাভান্" পৌছিলাম। সাভান্ হইতে "থাওই" পর্য্যন্ত একটী ব্রাঞ্চ লাইন আছে। আমরা ৩।১ মিনিটে "ভাট্নী" গেলাম। ভাট্নী হইতে এক শাখা "বারহাজ বাজার" ও অন্য শাখা "বানারস" গিয়াছে। আমরা ৫—৬ মিনিটে "গোরকপুর" পৌছিলাম। এখান হইতে "উস্কাবাজার" হইয়া "গণ্ডা" পর্য্যন্ত একটী লুপ লাইন ও গণ্ডকী তীরে

"বাগাহা" পর্য্যন্ত একটী শাখা লাইন গিয়াছে। বেঙ্গল নর্থ-ওয়েষ্টারণ্-রেলওয়ের হেড অফিস্ "গোরকপুর"। ইহা যুক্ত-রাজ্যের একটী বিভাগ।

বঙ্গদেশ ত্যাগ করায় অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। হায়! স্বর্ণ-প্রসূ বঙ্গমাতার সেই শষ্পময় শ্যামল-প্রান্তর আর নাই। এখন চতুর্দ্দিকে কেবল মরুভূমির মত দুর্ব্বাদল শূন্য প্রান্তর, ক্বচিৎ দুই একটী মৃতপ্রায় পাদপ বক্ষে ধারণ করিয়া নির্জ্জীবের মত:পড়িয়া আছে। এ বড় ভয়ানক দেশ। এ প্রদেশে বন জঙ্গল নাই, পশু পক্ষী নাই, বৃক্ষ লতা নাই, পাখীর সুমধুর কল-রব নাই, কিছুই নাই; আছে কেবল সজীবতা-শূন্য সুদীর্ঘ প্রান্তর ও পাষাণবৎ মৃত্তিকা। বঙ্গবাসীরা যেমন কোন গ্রামে একটা বৃহৎ স্থান ব্যাপিয়া কতকটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বাস করে, এ অঞ্চলে সেরূপ নহে। তস্কর ও দস্যুভয় নিবারণার্থ এ দেশে মাঠের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গ্রাম্য লোকেরা সমবেত হইয়া সহরের ন্যায় এক বাড়ীর সহিত অন্য বাড়ী সংলগ্ন করিয়া বাস করে। এ দেশের গৃহ এত ছোট যে, আমার ন্যায় খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিও অনায়াসে ছাদস্পর্শ করিতে পারে। গৃহাভ্যন্তরে একটীও বাতায়ন নাই।

ইহার অভ্যন্তর এমন গাঢ় তমসাবৃত যে, সূর্য্যদেব সহসা প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াই যেন প্রত্যহ বহির্দ্দেশ হইতে উঁকি ঝুকি মারিয়া চলিয়া যাইতেছেন। আমাদের দেশে এ প্রকার গৃহে বাস করিলে ডাম্প্ লাগিয়া তাহাকে তিন দিবসের মধ্যেই শমন ভবনে যাইতে হয়; কিন্তু এ প্রদেশের শুষ্ক জল বায়ু দ্বারা পরিপুষ্ট ব্যক্তিদিগের এবম্বিধ গৃহই উপযোগী। কারণ, দারুণ গ্রীষ্মকালে দিনের বেলা এ ঘর বেশ ঠাণ্ডা থাকে, এবং জানালা না থাকায় ভয়ানক শীতেও কবাট বন্ধ করিলে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বায়ু লাগিবার আশঙ্কা থাকে না। বঙ্গদেশের মত বাঁশ, তালাই, চাটাই ইত্যাদির বেড়া এখানে নাই। হিন্দুস্থানীগণ কেবল মৃত্তিকার দ্বারা দেয়াল গাঁথিয়া ঘরের বেড়া দেয়। এ দেশের লোক এত গরীব, যে যাহার মাত্র একশত টাকা আছে সে এ দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। এ অঞ্চলে সর্প ভয় বড় বেশী। রাত্রিকালে কেহ সর্প ভয়ে পথে ভ্রমণ করে না। গোরকপুরে একটী লালবর্ণের হস্তী দেখিতে পাইলাম। লালবর্ণের হস্তী আর কখনও দেখি নাই। রেলপথে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সুদূর নেপালের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালার শোভা মনোহারিনী। বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্টারণ্-রেলওয়ের গাড়ী

ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল যায়। ইহা ইষ্টারণ্-বেঙ্গল-ষ্টেট-রেলওয়ের গাড়ী অপেক্ষা কিছু বড়। আমরা রাত্রি ৮৷৩১ মিনিটে "বস্তি" পৌঁছিলাম। ইহা যুক্তরাজ্যের একটী জেলা। বস্তি হইতে কয়েক ষ্টেসন অগ্রসর হইয়া ১০—৩৩ মিনিটে "মান্‌কাপুর" জংশনে গেলাম। মান্‌কাপুর হইতে "অযোধ্যাঘাট" বা "লকারমণ্ডিঘাট" পর্য্যন্ত এক শাখা লাইন গিয়াছে। মান্‌কাপুরের এক ষ্টেসন পরে "গণ্ডা" পৌঁছিলাম। ইহা যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত ফয়জাবাদ বিভাগের একটী জেলা। গণ্ডা হইতে "নান্‌পারা" জংসন হইয়া "নেপালগঞ্জরোড" পর্য্যন্ত এক লাইন গিয়াছে, এবং গোরকপুর পর্য্যন্ত এক লুপ লাইন বিস্তৃত আছে।

আমরা গণ্ডা জেলা উত্তীর্ণ হইয়া ইতিহাস-বিখ্যাতা সরযু নদী পার হইলাম। সরযু দর্শন করিয়া আমার হৃদয় আবেগ-ভরে মাতিয়া উঠিল। এখানে কত কথাই মনে উদয় হইল! হায়, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই যে সরযু একদিন ভগবচ্চরণ স্পর্শে পবিত্রীকৃত—পৃথিবীর কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা-মহানগরীর বিজয়-কীর্ত্তি দেশ দেশান্তরে সগৌরবে ঘোষণা করিত, যাহার উভয় তট-প্লাবিত স্থান একদা ঋষিজনাধ্যুসিত দেশ বলিয়া কথিত হইত, যাহার পুণ্যতোয়স্পর্শে এক কালে কোশল-রাজ্যের অপাক্ষর

সাধারণ নিজকে ধন্য মনে করিত, সেই মহাতীর্থ, সেই ঐতিহাসিক পূতঃসলিলা সরযূ এখনও আছে, এখনও প্রাচীন-কীর্ত্তি-গরিমা শুষ্কবক্ষে ধারণ করিয়া দুঃখে প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা ক্রমে সরযূ ও গঙ্গার প্রধান উপনদী "ঘর্ঘরা" পার হইয়া রাত্রি ২।১৮ মিনিটে "বর-হোয়াল" ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। ইহা একটী জংশন। এখান হইতে একটী ক্ষুদ্র শাখা "বারহামঘাট" ও একটী বৃহৎ শাখা "কানপুর" গিয়াছে। ইহার দুই ষ্টেসন পরে আমরা "বড়বাঙ্কি" পৌঁছিলাম। বড়বাঙ্কি ফয়জাবাদ বিভাগের একটী জেলা। এখান হইতে ফয়-জাবাদ একটী ব্রাঞ্চ লাইন আছে। বড়বাঙ্কি হইতে রওনা হইয়া ৪।৩৫ মিনিটে "ডালিগঞ্জ" জংসনে আসিলাম। ডালিগঞ্জ হইতে রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন রেলওয়ে (মিটার গেজ ট্রেণ) কানপুর গিয়াছে। আমরা কাটিহার হইতে "লক্ষ্ণৌ জংসনের" টিকেট না লইয়া ভ্রমবশতঃ "লক্ষ্ণৌ সিটির" টিকেট লইয়া ছিলাম, এখানে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া লক্ষ্ণৌ জংসনের টিকেট লইয়া এই শাখা লাইনের (1, up passenger) গাড়ীতে উঠিলাম।

পঞ্জাবের স্বনাম ধন্য চিকিৎসক মৃত লছমন দাসের

বর্ত্তমান চেলা শ্রীঘনইয়া দাসের চারিজন শিখ এজেণ্ট এই গাড়ীতে উঠিল, ইহারা লক্ষ্ণৌ হইয়া অমৃতসর যাইবে। ইহারা বঙ্গদেশে প্রত্যেক বৎসর গ্রামে গ্রামে হাঁটিয়া ঔষধ বিক্রয় করে। ইহাদের ঔষধ সমস্ত জেলায় প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। ইহাদের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন হইল। ইহারা বেশ ভদ্র। ইহাঁরা আমাদিগকে ভ্রমণ উপলক্ষে তাহাদের প্রধান তীর্থ স্থান অমৃতসর দর্শন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিল।

আমরা "লক্ষ্ণৌ সিটি" ষ্টেসন হইয়া "আয়েসবাঘ" জংসনে আসিলাম। বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টারণ্ রেলওয়ের গাড়ী এই জংসন হইয়া কানপুর গিয়াছে।

আমরা ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে ৫।১৮ মিনিটে লক্ষ্ণৌ জংসনে নামিলাম। আমাদের সহিত শিখ চারি-জন নামিল। লক্ষ্ণৌ আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে ও রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ের জংসন। লক্ষ্ণৌ সিটি হইতে লক্ষ্ণৌ জংসন চারি মাইল ব্যবধান। গোমতী-তীরে বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ নগরী নির্ম্মিত হইয়াছে। গোমতী প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িতা, ঐতিহাসিক নদী। গোমতী তীরে মৃত্যুর অশুভফল ব্যঞ্জক বিশ্রুত একটী প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা—

"ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং
হট্ট-মন্দিরে।
মরণং গোমতী তীরে অপরে কিং
ভবিষ্যতি ॥"

আজও লোকের মুখে মুখে এই শ্লোক উচ্চারিত হইয়া থাকে।

ষ্টেসনের অনতিদূরে একটী বৃক্ষতলে আমরা সকলে আশ্রয় লইলাম। শিখেরা বৃক্ষের নীচে পরিষ্কার কম্বল বিস্তার করিয়া বসিল। আমরা বুভুক্ষা-পীড়িত হইয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানে আমাদের জিনিষাদি রাখিয়া রন্ধনোপ-যোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিবারজন্য বাজারে বহির্গত হইলাম। বাজারের রাস্তা ঘাট বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। হিন্দুস্থানী রমণীগণ দোকানীর কার্য্য করে। আমরা তাহাদের নিকট হইতে চাউল, দাল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিলাম। এখানে ইন্দারার সুশীতল জলে স্নান করিয়া একটী পরিষ্কৃত স্থানে রন্ধনাদি সমাপনান্তে তুইদিন পর তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। এখানে প্রভাতেই বেশ গরম বোধ হইল।

লক্ষ্ণৌর খরমুজ প্রসিদ্ধ। ইহা স্বাদু ও সুমিষ্ট। ভারতে এরকম খরমুজ আর কোথাও পাওয়া যায় না। গ্রীষ্ম

কালে একটী খরমুজ ভক্ষণ করিলে পিপাসা নিবৃত্তি হয়, শরীর শীতল হয়, এবং চিত্ত স্ফূর্ত্তি জন্মে। বাজারে খরমুজ দর্শন করিয়া আমরা ইহাকে আমাদের দেশী খরমুজের ন্যায় নিরস মনে করিয়া প্রথমতঃ উপেক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু শিখরা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় ইহা ক্রয় করিলাম। তাহারা না বলিলে আমরা এই উপাদেয় ফলের আস্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইতাম। লক্ষ্ণৌ ডবল পয়সা চলে না। এ স্থান সাগরজল হইতে অনেক উচ্চ। অন্ততঃ এক শত হাত খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না এখানে দুগ্ধ এবং ঘৃত বেশ সুলভ। পাকা ওজনের উৎকৃষ্ট মহিষ ঘৃতের সের এক টাকা, এবং জাল দেওয়া দুগ্ধের সের দশ পয়সা। এখানে যুক্ত রাজ্যের ছোট লাট অবকাশ সময়ে অবস্থান করেন।

লক্ষ্ণৌ অযোধ্যার মুসলমান ভূপতিগণের রাজধানী। অযোধ্যার প্রথম নবাব সাদত আলি খাঁ লক্ষ্ণৌর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত ওয়াজিদআলি সা অযোধ্যার শেষ নবাব ছিলেন। লক্ষ্ণৌর প্রধান দর্শনীয় মচ্ছিভবন দুর্গ, ছত্রমঞ্জিল প্রাসাদ, হোসেনাবাদ, এমাম-বাড়া ও ওয়াজিদ আলির কীর্ত্তি "কৈশারবাগ"। কৈশারবাগের একটী ফটক প্রস্তুত করিতে লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এজন্য

ইহা "লাথী গেট" বলিয়া বিখ্যাত। সহরের মধ্যে গোমতী তীরে ভগ্নঅট্টালিকাময় বিখ্যাত "বেলিগার্ড"। বেলিগার্ড সিপাহী বিদ্রোহের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইংরাজেরা এই স্থানে ছয় মাস অবরুদ্ধ থাকিয়া আত্মরক্ষা করেন।

লক্ষ্ণৌর পূর্ব্ব গৌরব স্মৃতি-পথে উদিত হওয়ায় আমার বড় কষ্ট হইল—কেমন যেন এক প্রকার যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই নবাব বাড়ি, অন্দরমহল, সীস-মহল, বিলাস-কক্ষ, বেগমের স্নানাগার, মনোহর বাগ, সুরম্য হর্ম্ম্য প্রভৃতি সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ কেহই নাই—যেন একটা ভূতের বাড়ী। সেই ইন্দ্রপুরীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও শেলবিদ্ধ হয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতের কি দ্রুত পরিবর্ত্তন! মহাকালের কি অসাধারণ শক্তি! অতি অল্পকালমধ্যে—মাত্র দেড় শত বৎসরে—লক্ষ্ণৌর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে—যুগান্তর ঘটিয়াছে। আমি আনমনে উদাসপ্রাণে ক্ষণ-বিধ্বংসী জনপদ সমূহের অসারতা চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমরা হরিদ্বার যাওয়া মনস্থ করিয়া ষ্টেসনে আসিলাম। হরিদ্বারের টিকেট লইয়া প্লাটফর্ম্মের উপরের সেতু পার হইয়া অন্য প্লাটফর্ম্মে যাইতেছি, এমন সময়ে একজন টিকেট-কালেক্টার আমার নাম কি, বাড়ি

কোথায়, ব্যবসা কি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি অনেক বিষয় উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে ওয়াচ্ খুলিয়া দেখি, ট্রেণ ছাড়ার সময় হইয়াছে, অথচ তাঁহার প্রশ্ন ফুরাইতেছে না; ইহাতে একটু বিরক্তি সহকারে তাঁহাকে বলিলাম "আপনার উদ্দেশ্য প্রশ্নের সূচনা হইতেই বুঝিয়াছি, আপনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি। ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইয়াছে, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য নহি। আপনার সন্দেহ দূরীকরণার্থ বলিতেছি, আমি বিপ্লবকারী দলভুক্ত নহি, আমি একজন পর্য্যটক।" ইহা বলিয়া আমি দ্রুত পাদবিক্ষেপে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা ১১।২৫ মিনিটে (7, up mixed) ট্রেণ ছাড়িল। আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোগলসরাই হইতে সাহারাণপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহা ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা ব্রড গেজ অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ ফুট ব্যবধানে ইহার রেল পাতা হইয়াছে। আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে লাইন এক হাজার মাইল বিস্তৃত; ইহার হেড আফিস্ লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌ হইতে হরিদ্বার ৩০৫ মাইল, ভাড়া ৩৻১০ তিন টাকা দুই পয়সা।

৩৭]

আমরা ১।২৪ মিনিটে "বালামো" জংসনে পৌঁছি-লাম। বালামো হইতে "মাধোগঞ্জ" পর্য্যন্ত একটী শাখা-রেল গিয়াছে। বালামো হইতে ২।২৫ মিনিটে "হরদুই" আসিলাম। হরদুই যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত লক্ষ্ণৌ বিভাগের একটী জেলা। হরদুই ছাড়াইয়া ৪।১১ মিনিটে সাজাহান-পুর (সাহাজানপুর) পৌঁছিলাম। সাজাহানপুর রোহিল-খণ্ড বিভাগের একটী জেলা। এখান হইতে "মৈলানি জংসন" পর্য্যন্ত একটী শাখা-রেল গিয়াছে। সাজা-হান বাদসাহ স্বীয় নামে এই নগর স্থাপন করেন। এস্থানের "রোজা ফ্যাক্‌টরি" দেখিবার জিনিষ। এই কারখানায় চিনি এবং "রম্" নামক এক প্রকার বিলাতী সৈনিকের ব্যবহার্য্য মদ্য প্রস্তুত হয়।

আমরা ৬।৩৮ মিনিটে "বেরিলি" জংসনে পৌঁছিলাম। ইহা বড় জংসন। বেরিলি হইতে চারিদিকে চারিটি লাইন বিস্তৃত আছে; যথা, কাট-গোদাম, পিলিভিৎ, চণ্ডৌসি ও কাসগঞ্জ। যাঁহারা হিমালয় প্রদেশের নাইনি-তাল পাহাড় দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ে কাটগোদাম যাইয়া তথা হইতে ২২ মাইল টোঙ্গায় যাইবেন। নাইনিতাল যুক্ত-রাজ্যের ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস। বেরিলি রোহিলখণ্ড ও

কুমায়ুন রেলওয়ের হেড অফিস। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত রোহিলখণ্ড বিভাগের অধীন ইহা একটী জেলা এবং এই বিভাগে বেরিলি সহর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে ট্রেণ কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করিয়া রাত্রি ৯—৫৫ মিনিটে "মোরাদাবাদ" ষ্টেসনে পৌঁছিল। মোরদাবাদ হইতে চণ্ডৌসি পর্য্যন্ত একটী লাইন আছে। চণ্ডৌসি জংসন হইয়া আলিগড় যাওয়া যায়। মোরাদাবাদ রোহিলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। মোরাদাবাদ হইতে "গাজিয়াবাদ" পর্য্যন্ত একটী শাখা রেল গিয়াছে। মোরাদাবাদ রামগঙ্গা নদী তীরে স্থাপিত। এই সহরের লোক সংখ্যা ৭৩,০০০। আমরা ২—৩৪ মিনিটে "নজিবাবাদ" জংসনে উপনীত হইলাম। নজিবাবাদ বিজনৌর জেলার তহসিল। এখান হইতে "কোটদোয়ারা" পর্য্যন্ত একটী শাখা-রেল গিয়াছে। যাঁহারা হিমালয়-বক্ষে ল্যান্সডাউন দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কোটদোয়ারা হইতে অশ্বারোহণে ২০ মাইল গমন করিবেন। মুশুরি এবং নাইনিতাল পাহাড়ের অর্দ্ধেক পথে, ঘারোয়াল প্রদেশে ল্যান্সডাউন অবস্থিত।

নাজিবাবাদে আমাদের কামরায় কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক উঠিল। ইহারা দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। ইহাদের

আকৃতি ও ভাষা অন্যরূপ। আমি ইহাদিগকে ইরাণ-দেশবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম, পরে অনুসন্ধানে জানিলাম, ইহারা মালবার প্রদেশের অধিবাসী। ইহাদের মধ্যে একজন মালবারের ব্রাহ্মণ আছে। ইহারা হরিদ্বার যাইতেছে।

আমরা রাত্রি ৪—৮ মিনিটে "লাকসর" জংসনে নামিলাম। এখানে গাড়ী বদলাইয়া ডেরাডুনের গাড়ীতে হরিদ্বার যাইতে হয়। আমি বাড়ী হইতে যে সকল রেলওয়ে গাইড্ সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহার সাহায্যে বঙ্গদেশ ও যুক্তরাজ্যের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমি অনায়াসে আসিয়াছি। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে আমার কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করার আবশ্যক হয় নাই। এখন যুক্তরাজ্য ছাড়াইয়া পাঞ্জাবে যাইতেছি, অথচ পাঞ্জাবের রাস্তা ঘাটের কোন অভিজ্ঞতা আমার নাই এবং ইহা কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। তাই একখানা পাঞ্জাবের টাইমটেবলের প্রয়োজন হইল। টাইমটেবল ভিন্ন দূর দেশে ভ্রমণ করা যে কত অসুবিধাজনক তাহা ভ্রমণকারী মাত্রেই অবগত আছেন। আমি হুইলার কোম্পানির পুস্তক বিক্রেতার নিকট গেলাম। সে ব্যক্তি আলমারীর সন্নিকটে উত্তানশায়ী হইয়া সুখে নিদ্রা

যাইতেছে ও মাঝে মাঝে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ রহিত এক-প্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিয়া স্তিমিত জগতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে; নৈশানিল সুযোগ পাইয়া একাকী তাহার কেশ লইয়া খেলা করিতেছে। তাহার মুখের অবয়ব দেখিয়া অনুমান হইল, সে কোন অননুভূতপূর্ব্ব সুখ বিমিশ্রিত স্বপ্ন-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহার সুখ-স্বপ্ন ভগ্ন করিতে আমার ইচ্ছা হইল না। আমি অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান রহিয়া প্রকৃতির খেলা দেখিলাম। ইতিমধ্যে সে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে তাহাকে আহ্বান করিলাম। সে অবিলম্বে উঠিয়া লণ্ঠনের সাহায্যে আল-মারী হইতে দুই আনা মূল্যের একখানা নর্থ-ওয়েষ্টারণ রেলওয়ের টাইমটেবল্ দিল।

আমরা ৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে ৬—৮ মিনিটে আউধ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে (45, mixed up) দেরাদুন শাখা-রেলে উঠিলাম। এখান হইতে মেন্ লাইন "সাহারাণপুর" গিয়াছে। হরিদ্বারের যাত্রী অনেক, কিন্তু আমরা দুইজন ভিন্ন আর বাঙ্গালী নাই। এ লাইনে লোক সংখ্যার তুলনায় গাড়ীর সংখ্যা নিতান্ত কম। বসিবার স্থান না হওয়ায় অনেকেরই দাঁড়াইয়া যাইতে হয়। যাত্রীদের মধ্যে দুই চারিজন সন্ন্যাসী আছে।

লাকসার ষ্টেসন ছাড়াইলে দেখিলাম আকাশের কোণে কাল মেঘ সাজিয়াছে। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মেঘ খানা তত ঘনীভূত বোধ হইতে লাগিল। "পোথরি" ষ্টেসনে আসিলে আমার চমক ভাঙ্গিল; আমি চাহিয়া দেখি—মেঘ নহে, চারিদিকে অস্পষ্ট পর্ব্বতমালা। আমি সত্য সত্যই প্রথমতঃ মেঘ ভাবিয়াছিলাম। যবালাপুর ষ্টেসন হইতে পর্ব্বতের দৃশ্য বড় সুন্দর দেখা গেল। এ পর্ব্বত অন্য পর্ব্বত নহে, ইহা গিরিরাজ হিমালয়। বাঙ্গালী জীবনে হরিদ্বারে বসিয়া হিমালয় দর্শন কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম, প্রাণ মাতিয়া উঠিল, চক্ষে জল আসিল। এই তুচ্ছ জীবনে শ্রীভগবানের মহতী অনুকম্পা দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত নেত্রে তাঁহাকে শত সহস্র অভিবাদন করিলাম। যবালাপুর ষ্টেসন হইতে দেখা গেল, চীন দেশের প্রাচীরের ন্যায় গগনের তিন দিক পর্ব্বত-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে এবং ট্রেণ খানা যেন হিমালয়ের ভিতরে প্রবেশ করিতে সমুৎসুক হইয়া, হিমালয়ের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাগরাভিসারিণী নদীর ন্যায় প্রাণপণে ছুটিয়াছে। এ দৃশ্য রমণীয়।

যবালাপুর ষ্টেসনে কয়েকজন পাণ্ডা উঠিল। নূতন

"যজমান" করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা হরিদ্বার হইতে আসিয়াছে। হরিদ্বার ষ্টেসনে অনেক পাণ্ডা উপস্থিত থাকে; সেখানে শিকার ধরিবার সুবিধা হয় না; এজন্য কেহ কেহ যবালাপুর আসে।

আমরা ৬।৫৫ মিনিটে হরিদ্বার নামিলাম। হরিদ্বারে পাণ্ডার অভাব নাই। প্লাটফর্ম্মের বাহিরে শত শত পাণ্ডা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাস করিল। ইহাদের ভৌগোলিক জ্ঞান যথেষ্ট,—বঙ্গদেশের অন্তর্গত ঢাকা বিভাগে বাড়ী বলায় ইহারা আমাদিগকে কাশী গয়ার খুব নিকটবর্ত্তী লোক স্থির করিল। ইহাদের উৎপাতে রাস্তায় চলা কঠিন; চারিদিক হইতে পাণ্ডারা অনবরত প্রশ্ন করিয়া বড় বিরক্ত করিল। আমরা ষ্টেসন হইতে এক মাইল দূরে হরিদ্বার সহরে আসিলাম। সহর গঙ্গাতীরে। আমার পিতৃকুলের কেহ হরিদ্বার আসেন নাই; মাতৃকুলের কেহ কেহ আসিয়াছেন, শুনিয়াছি। পাণ্ডারা দুই হস্ত লম্বা ও অর্দ্ধ হস্ত প্রশস্ত বৃহৎ খাতা বাহির করিয়া আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের নাম খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু অনুসন্ধানে কোন নাম না পাওয়ায় আমরা স্বেচ্ছানুরূপ শ্রীহরিপ্রসাদ ঠিকাদার নামক জনৈক পাণ্ডাকে বরণ করিয়া লইলাম। পাণ্ডার বাসা গঙ্গার

উপরে। দালানের ভিত্তি গঙ্গা-গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। পাণ্ডার গৃহে বসিয়া গবাক্ষ-পথে মা গঙ্গার জল ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। স্বল্প পরিসরা সুগভীরা অনন্তশোভাময়ী হিমাঙ্গিনী ভাগিরথী পর্ব্বত-গাত্র প্রক্ষালন করিয়া পাতকীর উদ্ধারার্থ ক্ষিপ্র গতিতে আর্য্যভূমে ছুটিয়াছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া বড় শান্তিলাভ করিলাম। এত শান্তি জীবনে পাই নাই। হরিদ্বার স্বর্গদ্বার, এ কথা অসত্য নহে। স্বর্গ না হইলে এরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব হয় কেন? মনের উল্লাসে দুই ঘণ্টা গবাক্ষ-পথে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিলাম। গঙ্গার অপর পারে চণ্ডীর পাহাড় ও তদুপরি চণ্ডীমাতার মন্দিরের দৃশ্য অনুপম। চট্টগ্রাম জিলায় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সীতাকুণ্ড ষ্টেসন হইতে চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের উপর বাবা চন্দ্রনাথের মন্দির যেমন বালকের ক্রীড়নকের ন্যায় দেখিয়াছি, হরিদ্বারে বসিয়া চণ্ডী মাতার মন্দির সেইরূপ ক্ষুদ্র দেখিলাম।

আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম। ব্রহ্মকুণ্ড স্থানটী বড় মনোরম। ব্রহ্মকুণ্ড বলাতে ইহাকে কেহ কুণ্ড-বিশেষ মনে করিবেন না। গঙ্গার তীরবর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষের নাম ব্রহ্মকুণ্ড। এখানে মন্দাকিনী অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে প্রবাহিতা হইয়াছেন। এই পবিত্র স্থান দর্শন

করিলে অসীম ভক্তির উদ্রেক হয়। কয়েক দিন যাবৎ আমাদের অবগাহন স্নান হয় নাই, অপিচ যুক্ত-প্রদেশের প্রচণ্ড উত্তাপে শরীর দগ্ধ হইতেছিল, আজ ভাগ্যবশাৎ সুরধুনী গঙ্গার পূত-সলিলে স্নাত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিলাম, শরীরের সমস্ত গ্লানি দূর হইল ও জন্মান্তরীণ কল্মষরাশি বিধৌত হইয়া শরীর নিষ্পাপ হইল। ফলতঃ ভক্তিভরে গঙ্গা স্নান করিলে সমস্ত পাপ বিদূরিত হয়, এ কথা ধ্রুব সত্য। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই ইহা বেদ-বাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। মহাপাপীরও গঙ্গা স্নানের অধিক প্রায়শ্চিত্ত নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। গঙ্গার প্রকৃত মাহাত্ম্য হরিদ্বারে আসিলে স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক নানা দিগ্ দেশ হইতে এখানে গঙ্গা স্নানোপলক্ষে আসিতেছে। ভারতের সমস্ত দেশের লোক এখানে আসে। দৈনিক এত লোকের আমদানী ভারতের অন্য তীর্থে বিরল।

হরিদ্বারে যেমন খাঁটি গঙ্গা পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও মিলে না। হরিদ্বার ছাড়াইলে গঙ্গার সহিত ক্রমে ক্রমে অনেক উপনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। হরিদ্বারে গঙ্গার জল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও সর্ব্বরোগ-

হয়। এখানে গঙ্গার জল বরফের ন্যায় শীতল। জলে অবগাহন করা মাত্রেই আমাদের উত্তপ্ত শরীর অবশ হইয়া গেল। আমি অতি কষ্টে ৪।৫ টি ডুব দিলাম।

হরিদ্বারের পাণ্ডারা যাত্রীদের নিকট একটী শ্লোক পাঠ করে, তাহা এই—"হরিদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে। স্নাত্বা কনখলে তীর্থে পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" এই সকল স্থান হরিদ্বারের অন্তর্গত।

যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দ্রৌপদী সহ হরিদ্বার হইতে ঋষিকেশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া লছমনঝোলা নামক সেতু পার হইয়া ক্রমে কেদারনাথ ও বদরিনারায়ণ দর্শন করিয়া স্বর্গে গমন করেন। ইহা মহাপ্রস্থানের পথ। বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত অনেক সাধু সন্ন্যাসী গমন করিয়া থাকে। হরিদ্বার হইতে বদরীকাশ্রম এক মাসের রাস্তা। এই পথ হাঁটিয়া যাইতে হয়। খাদ্যদ্রব্য মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। অনেক সময় এই দুর্গম পথ নগ্নপদে শুধু বরফের উপর দিয়া হাঁটিতে হয়। বড় কঠোর ব্রত। এই পথে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হয়। এ জন্য অনেকে ছাতি এবং বরফে হাঁটিবার উপযোগী এক প্রকার চর্ম্মপাদুকা সঙ্গে লইয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য বড় মহার্ঘ। নিতান্ত হীনভাবে গেলেও একশত টাকার কমে যাতায়াত হয় না। কেদারনাথ শৃঙ্গ

২২,৭৯০ ফুট উচ্চ। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় এবং হিমালয়ের এই মহাপ্রস্থানের পথে সুকৃতিবশাৎ কেহ কেহ মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। হরিদ্বারে প্রায়শঃই বৃষ্টি হয়। বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে তিন চারিবার বৃষ্টি হইল। এখানে অন্ন আহার করার সুবিধা না হওয়ায় আমরা ফলাহার করিলাম। স্বর্গদ্বারে আসিয়াও দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে পারিলাম না। আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ বড় উদ্বেগ বোধ হইল,হৃদয় কালিমায় আচ্ছন্ন হইল, মন দুঃখের আঁধারে ডুবিয়া গেল! সহসা বিনা কারণে কেন এমন পরিবর্ত্তন হইল, তাহার উদ্দেশ্য আমিও খুঁজিয়া পাইলামনা। অন্নাহার করিতে পারি নাই বলিয়া মনে একটু কষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কষ্ট ইহার তুলনায় অতি সামান্য। আমার অনুমান হইল যেন কোন দৈববলী শক্তি আমার অজ্ঞাতসারে আমার মনের উপর কার্য্য করিতেছে, এবং তাহাতেই এত অশান্তি অনুভূত হইতেছে। আমি অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মহর্ষি নহি, আমার পরচিত্ত অবধারণ শক্তি অথবা অন্তর্দৃষ্টি জন্মে নাই যে তৎক্ষণাৎ যোগ বলে ইহার প্রকৃত তথ্য অবগত হইব। তবে সাধারণ জ্ঞানে আমার এইরূপ প্রতীয়মান হইল,

কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় আমাকে স্মরণ করিয়া আমার জন্য ব্যথিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার মানসিক প্রতিবিম্ব আমার হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় আমাকে বিষাদিত করিয়াছে। ইচ্ছাশক্তিতে কিনা হয়? যে শক্তির তাড়িত-বিনিময়ে মানুষ মানুষকে ভালবাসে এবং যে শক্তির তাড়িতাকর্ষণে মোহাবিষ্ট মিডিয়মকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করা যায় ইহা সেই ইচ্ছাশক্তির গুপ্ত আকর্ষণের ফল। সুধী পাঠক! আমার এ যুক্তি বোধ হয় মনোবিজ্ঞানের বহির্ভূত নহে। আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম।

এখানে পাণ্ডারা যাত্রীদের উপর অর্থের জন্য অন্যান্য তীর্থ স্থানের ন্যায় অত্যাচার করে না, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের দাবী নিতান্ত কম নহে।

আমরা অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় অর্দ্ধক্রোশ হাঁটিয়া ষ্টেসনে আসিলাম। এখানে তিনজন বাঙ্গালী যুবকের সহিত পরিচয় হইল। ইঁহারা ডেরাদুন যাইতেছেন। কাটিহার ত্যাগ করিয়া প্রায় আট শত মাইল পরে—বঙ্গদেশ হইতে অনেক দূরে—প্রথম বাঙ্গালী সন্দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইলাম। কিন্তু প্রাণ খুলিয়া দু'দণ্ড কথোপকথন করিবার অবকাশ নাই,

কারণ টিকেটের ঘণ্টা পড়িয়াছে। টিকেট-গৃহে যাইয়া দেখিলাম, হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীতে গৃহ পরিপূর্ণ। চারিদিকে অগণিত পাগড়ী ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। কাটিহার অনেক কষ্টে টিকেট করিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে প্রবেশেরই অধিকার হইল না। অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া কি করিব চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সেই বাঙ্গালী যুবকদের সহিত দেখা হইল তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপ্রসাদ গুপ্ত একজন বলিষ্ঠ যুবক। তিনি সাগ্রহে আমাদের জন্ত টিকেট করিতে একটী যুবককে পাঠাইলেন; তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে কামাখ্যা বাবু অতি কষ্টে দুইখানা জম্বু (টাউই) টিকেট ক্রয় করিয়া আনিলেন তাঁহার উদারতায় আমি যথেষ্ট উপকৃত হইলাম, ও তাঁহাকে শতবার প্রশংসা করিলাম।

হরিদ্বার হইতে জম্বু (টাউই) ৪০১ মাইল, ভাড়া ৪৸০ আনা। আমরা ৩৩৭ মিনিটে (46, D. L. passenger) ট্রেণে জম্বু রওনা হইলাম। নর্থ-ওয়েষ্টারণ-রেলওয়ে যে গাড়ী দেরাহুন হইতে আসিয়াছে আমরা সেই গাড়ীতে উঠিলাম। সুতরাং আর লাকসার-জংসনে কিম্বা সাহারাণপুরে গাড়ী বদল করিতে হইল না।

৪৯]

এই গাড়ীতেই পঞ্জাব চলিলাম। যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তত লোকের আকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত ভাষার পরিবর্ত্তন বুঝিলাম। কাটিহার পর্য্যন্ত বঙ্গভাষা শেষ হইল। কাটিহার হইতে লক্ষ্ণৌ পর্য্যন্ত হিন্দি ভাষা শুনিলাম। লক্ষ্ণৌ হইতে উর্দ্দু ভাষা আরম্ভ হইল। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীর আকৃতিতে যেমন প্রভেদ, হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীর আকৃতিতে তেমন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। আমরা সায়ংকালে ৬।৫০ মিনিটে সাহারাণপুর জংসনে পৌঁছিলাম। এখান হইতে দিল্লি পর্য্যন্ত শাখা-লাইন আছে। সাহারাণপুর যুক্ত-প্রদেশের সীমন্ত জেলা। ইহা মিরাট-বিভাগের অন্তর্গত। এই জংসনে আউধ-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ে ও নর্থ-ওয়েষ্টারণ-রেলওয়ে মিলিত হইয়াছে। লাকসর হইতে সাহারাণপুর আসিতে পথে রুড়কির বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ দেখা গেল। সাহারাণপুর হইতে ৭—৩৭ মিনিটে রওনা হইয়া রাত্রি ৯—৩৭ মিনিটে "আম্বালা" পৌঁছিলাম। এখান হইতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ের এক শাখা দিল্লি ও অন্য শাখা "কাল্কা" পর্য্যন্ত গিয়াছে। আম্বালা পঞ্জাবের অন্তর্গত দিল্লি-বিভাগের একটী জেলা। যুক্তরাজ্য হইতে পঞ্জাবে প্রবেশ করিতে আম্বালাই পঞ্জাবের প্রথম জেলা পড়ে।

পঞ্জাবে আসিব ইহা এ জীবনে আশা করি নাই। পঞ্জাবে প্রথম প্রবেশ করিয়াই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিলাম। বাঙ্গালী জীবনে ইহা একটু নূতনত্ব বই কি! আমি ইষ্টারণ-বেঙ্গল-ষ্টেট-রেলওয়ে, বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্টারণ-রেলওয়ে, বোম্বে বরদাও-সেণ্ট্রাল-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান-রেলওয়ে, গ্রেট-ইণ্ডিয়ান-পেনিন্‌সুলা-রেলওয়ে, আউধ-রোহিলখণ্ড-রেলওয়ে প্রভৃতি যত গুলি লাইনে ভ্রমণ করিয়াছি, তন্মধ্যে নর্থ-ওয়ে-ষ্টারণ-রেলওয়ের গতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহা সর্ব্বত্রই ঘণ্টায় ৪৫ মাইল চলে। এই রেলওয়ের বিস্তার চারি হাজার মাইলের উপর। শুধু ভারতে কেন, পৃথিবীতে এত বড় বিস্তৃত রেলওয়ে লাইন আর নাই। ইহার প্রধান শাখা করাচী বন্দর হইতে আফগানিস্থানের সীমা "জামরুড" পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, এবং করাচী হইতে ব্রীটিশ বেলুচীস্থানের রাজধানী কোয়েটা পর্য্যন্ত আর এক শাখা গিয়াছে। এ দিকে লাহোর হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত অন্য লাইন গিয়াছে। ইহার লাইন ব্রড গেজ সাড়ে পাঁচ ফুট।

আম্বালা অতি প্রাচীন স্থান। আর্য্যেরা এই স্থানে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী তীরে প্রথম বাসস্থান স্থির

করিয়াছিলেন। আজকাল এই দুই নদী কাগার নামে পরিচিত। আজিও এইখানে অনেক দেবালয় প্রাচীন স্মৃতি বহন করিয়া আর্য্যদিগের কীর্ত্তি-কাহিনী ঘোষণা করিতেছে। মুসলমান রাজত্বের সময়ে আম্বালা অতি উন্নত সহর ছিল। বর্ত্তমান সময়েও ইহা একটী বিস্তীর্ণ সহর। এই সহরের লোক সংখ্যা ২৬,০০০। এখানে একটী বড় দুর্গ আছে। এ স্থানের স্বাস্থ্য মন্দ নহে।

আম্বালা হইতে রাত্রি ১০।১৭ মিনিটে রওনা হইয়া ১১।১০ মিনিটে "রাজপুরা" জংসনে উপনীত হইলাম। এখান হইতে পাতিয়ালা মহারাজার রাজ্য দিয়া "ভাটিণ্ডা" জংসন পর্য্যন্ত একটী শাখা-লাইন গিয়াছে।

রাজপুরা হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ২।১ মিনিটে "লুধিয়ানা" জংসনে পৌঁছিলাম। এই জংসন হইতে এক ব্রাঞ্চ "ফিরোজপুর" জেলা ও অন্য ব্রাঞ্চ 'ধুরি" হইয়া "জাখাল" গিয়াছে। লুধিয়ানা জলন্দর বিভাগের একটী জেলা। সকলেই জানেন, লুধিয়ানার শাল প্রসিদ্ধ। লুধিয়ানা হইতে বিদ্যুৎবেগে গাড়ী চলিল। আমরা ২।৪০ মিনিটে "ফিলোর" পৌঁছিলাম। ফিলোর জলন্ধর জেলার তহসিল। এখানে যে পাঁচটী নদী লইয়া (পঞ্চ-অপ) পঞ্জাব নাম হইয়াছে, তাহারই একটী নদী

"সাটলেজ" পার হইলাম। আরোহীর সংখ্যা বেশী হওয়াতে শুইবার স্থান ছিল না, আমরা সারারাত্রি বসিয়া রহিলাম। রাত্রি ৩।৫৪ মিনিটে গাড়ী জলন্ধর পৌঁছিল। জলন্ধর পঞ্জাবের একটী বিভাগ। এখানে একটী বৃহৎ দুর্গ আছে। জলন্ধর ষ্টেসন হইতে হোসিয়ারপুর জেলা পর্য্যন্ত রেল হওয়ার প্রস্তাব চলিতেছে।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে মহাদেব মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে থাকেন। বিষ্ণু সেই দেহ চক্র দ্বারা ছেদন করেন। বিষ্ণুচক্র ছিন্ন সেই নিত্য চিন্ময় দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক পঞ্চাশৎ অংশে বিভিন্ন হইয়া যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানকে মহা-পীঠস্থান কহে। এই এক পঞ্চাশৎ মহা-পীঠের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি এক পঞ্চাশৎ এবং তাঁহা-দিগের ভৈরবও এক পঞ্চাশৎ। জলন্ধর বিভাগে দুইটী মহাপীঠ আছে, যথা :—

জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্ত-ভৈরবঃ। অম্বিকা সিদ্ধিদা নাম্নী।

পুনং জলন্ধরে মম, ভীষনো ভৈরব স্তত্র দেবী ত্রিপুর-মালিনী।

(পীঠমালা)

জ্বালামুখীতে জিহ্বাপাত হয়, তথায় দেবের নাম উন্মত্ত-ভৈরব, অম্বিকার নাম সিদ্ধিদা। জলন্ধরে স্তনপাত হয়, তথায় ভীষণ নামে ভৈরব অধিষ্ঠিত, দেবীর নাম, ত্রিপুরমালিনী।

এই মহাপীঠদ্বয় জলন্ধর বিভাগের অন্তর্গত কাঙ্গড়া জেলায় অবস্থিত। পাঞ্জাবের এই দুইটী মহাতীর্থ ধর্ম্ম-পিপাসু দর্শকের চক্ষে অতীতের এক রহস্য-দ্বার উদ্ঘাটন করে।

"বিয়া" ষ্টেসনের সন্নিকটে বিখ্যাত বিয়া নদীর প্রকাণ্ড পোলের উপর দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য নদী বড়ই বেগবতী। তেমন বলবান পুরুষ ইহার এক বুক জলে কখনই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না, মুহূর্ত্তে তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে।

গাড়ীতে পঞ্জাবের একজন জাঠ সম্প্রদায়ভুক্ত ভদ্র-লোকের সহিত আমার পরিচয় হইল, তিনি শান্ত, বুদ্ধিমান এবং স্থিরোন্নত চিত্ত। ঘনকৃষ্ণ গোঁপ ও শ্মশ্রু রাশি তাঁহার চেহারার গাম্ভীর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি দীর্ঘকায়, বলশালী ও শ্রীসম্পন্ন। তাঁহার জমিদারী আছে। পঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশের জমিদার বঙ্গদেশের

জমিদার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পাঞ্জাবে ও যুক্তরাজ্যে যাহার গ্রামের বা মৌজার অংশ থাকে এবং যে গবর্ণমেণ্টে নিজে ডাইরেক্ট খাজনা দাখিল করে তাহাকে জমিদার কহে। এ সকল প্রদেশে প্রতি গ্রামে জমিদারের সংখ্যা কম নহে। জমিদারকে পঞ্জাবী ভাষায় "জিমিদার" কহে।

তাঁহার সহিত সমস্ত রজনী অনেক কথোপকথন হইল। পঞ্জাবের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত এবং সমগ্র ভারতবর্ষে পঞ্জাবের ন্যায় নিরক্ষর প্রদেশ আর নাই বলিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি আমাকে শিখ-জাতির পবিত্র তীর্থ অমৃতসহর ও তথাকার স্বর্ণমন্দির দর্শন করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, এবং পাঞ্জাবে ইহা প্রধান দর্শনীয় বলিয়া আমাকে সবিনয়ে জেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যবহার এত সরল ও মধুর যে তাঁহার অনুরোধ আমি কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ তিনি অমৃতসরোবরের যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বলিলেন, তাহা শুনিয়া ঐ সরোবর দর্শন করিতে আমার সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিল। ঘটনাটী এই:—অনেক বৎসর অতীত হইল একটী কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি

তাহার স্ত্রী সমভিব্যাহারে অমৃত-সরোবরের তীরে আসে। তাহার স্ত্রী তাহাকে সরোবরের তীরে রাখিয়া কোন কার্য্যবশতঃ স্বল্প কালের নিমিত্ত অন্যত্র যায়। ইতি মধ্যে ঐ ব্যক্তি মুখ প্রক্ষালনার্থ তাহার দক্ষিণ হস্ত যেমন সরোবরে নিমজ্জন করিয়াছে, অমনি সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, তাহার হস্ত স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে যে কুষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন মাত্রও নাই। ইহাতে সে অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত শরীর জলে নিমজ্জন করিয়া রোগশূন্য দেহ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু পাছে তাহার স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া চিনিতে না পারে এই আশঙ্কায় তাহার অপর হস্ত জলে নিমজ্জন না করিয়া রোগের চিহ্ন রাখিল। ইত্যবসরে তাহার স্ত্রী আসিয়া স্বামীকে না দেখিতে পাইয়া বিশেষ চিন্তাকুলিত চিত্তে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ঐ কুষ্ঠগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার পরিচয় দেওয়া সত্বেও সাধ্বী স্ত্রীর কিছুতেই প্রত্যয় হইল না। অবশেষে সে তাহার বাম হস্ত দেখাইয়া আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বলায় সতী রমণীর আনন্দের সীমা রহিল না। তাহার স্বামী পূর্ব্বের ন্যায় বাম হস্ত জলে নিমজ্জন করিয়া সম্পূর্ণ নিরোগী হইল

এবং ঈশ্বরের অসীম দয়ার পরিচয় পাইয়া তাহারা আনন্দাশ্রু ত্যাগ করিতে করিতে স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিল।

উক্ত জাঠ ভদ্রলোকের পরিচিত বস্ত্র ব্যবসায়ী বরকত রাম ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রণজয় রাম নামক দুইজন পঞ্জাবী ক্ষত্রিয় অমৃতসহরে তাহাদের আড়তদার লালা বিশনদাস ও পরমেশ্বরী দাসের দোকানে যাইতেছিল। তাহাদের সঙ্গে তিনি আমাদিগকে যাইতে বলিলেন, এবং যাহাতে আমাদের কোন অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিলেন। তাঁহার মধুর আলাপন আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।

৯ ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে আমরা তাঁহার নিকট গভীর দুঃখের সহিত বিদায় লইয়া (Journey break করিয়া) ৭টা ১৭ মিনিটে অমৃতসহরে অবতরণ করিয়া উক্ত ক্ষত্রিয়-দ্বয়ের সহিত হরিসিংহের কাটরায় (একটী গলির নাম, গলির পঞ্জাবী নাম কাট্‌রা) তাহাদের আড়তদারের দোকানে উপনীত হইলাম।

আড়তদার লালা বিশনদাসের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্রগণ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালা পরমেশ্বরী

দাস এখন এই দোকানের সত্বাধিকারী। তাঁহারা শাল, বনাত, প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রের কারবার করেন। অমৃতসহরে তাহাদের দশ বারটী দোকান আছে; এতভিন্ন অন্যান্য জেলায় ও আছে। তাঁহারা ধন-কুবের, অথচ প্রত্যেকেই বিনয়ী ও ভদ্র। একটী দ্বিতল-গৃহের নিম্ন প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের দোকান এবং উপরের প্রকোষ্ঠে তাঁহাদের বিশ্রাম ঘর। আমরা যখন দোকানে উপস্থিত হইলাম, তখন লালা পরমেশ্বরী দাস দোকানে ছিলেন না; তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী আমাদিগকে ভদ্রতা করিয়া উপরের প্রকোষ্ঠে থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, আমাদিগের আর কোন অসুবিধা রহিল না। তাঁহাদের এইরূপ সৌজন্যতা দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম।

আমরা কিয়ৎকাল দোকানে বিশ্রাম করিয়া বরকত্ রাম ও রণজয় রামের সহিত স্বর্ণ-মন্দির দর্শন করিতে চলিলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই মন্দির দেখা গেল।

বিখ্যাত শিখ-গুরু রামদাস, দিল্লীর বাদসাহ আকবরের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর এক প্রকাণ্ড জলাশয় খনন করাইয়া তদুপরি মর্ম্মর প্রস্তরের স্বর্ণাচ্ছাদিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জলাশয়ের তীর হইতে মন্দির

পর্য্যন্ত মার্ব্বল প্রস্তরের অতি মনোহর সেতু আছে। এই জলাশয় অমৃতসরোবর এবং সেতুটী অবিনশ্বর সেতু (Tool of immortality) নামে প্রখ্যাত। এই সরোবরে স্নান করিয়াই পূর্ব্ব বর্ণিত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। অমৃতসরোবরের স্বর্ণ-মন্দির শিখ জাতীর পবিত্র উপাসনার স্থান। ইহা দশম গুরু গোবিন্দসিংহের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই মন্দিরকে পঞ্জাবীরা গুরুদোয়ারা (গুরুদ্বার) কহে। এই সরোবর গৃহ মধ্যে শিখ জাতীর প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ "গ্রন্থসাহে-বের" পূজা হইয়া থাকে। "গ্রন্থসাহেব" গুরু নানকের লিখিত। আমরা অমৃতসরোবরে স্নান করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দির মধ্যে গুরু গোবিন্দসিংহের সমাধি বিদ্য-মান। সমাধিস্থানের নিকটে পূজক ও পুরোহিত বসিয়া আছে এবং চারি পাঁচজন গায়ক বাদ্য-যন্ত্রসহকারে গান করিতেছে। আমরা সঙ্গীতের অর্থ বুঝিলাম না, কারণ ইহার ভাষা পাঞ্জাবী। সঙ্গীতের অর্থ না বুঝিলেও ইহা এমনই করুণ, প্রাণস্পর্শী ও মধুর যে ইহার স্বর লহরী আমাদিগকে যেন অলক্ষ্যে বলিয়া দিল, যে ইহা গুরু গোবিন্দ সিংহের অভাব জ্ঞাপন করিতেছে। সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তিতে গোবিন্দসিংহের বিয়োগ-বিধুরতা আমাদের

হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে বাজিয়া উঠিল; আমরা যন্ততঃ ক্ষণকালের জন্ত ব্যথিত হইলাম।

অনেকক্ষণ সঙ্গীত শুনিয়া আমরা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। মন্দিরের উপরার্দ্ধ সোণার পাতের দ্বারা মোড়ান। দৃশ্ত বড় রমণীয়, নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। আমরা দ্বিতল গৃহে উঠিয়া সোণার পাতে হাত দিয়া দেখিলাম ইহা বেশ পুরু। স্বর্ণপাত মন্দির গাত্রে এমন দৃঢ়রূপে সংলগ্ন যে সহজে এবং শীঘ্র ইহা ধ্বংস হইতে পারে না। গুরুগোবিন্দের সমাধিস্থানে সকলেই ইচ্ছামত কিছু কিছু দান করিয়া থাকে। এখানে যাত্রীদের উপর কোন অত্যাচার নাই। শিখেরা গুরুগোবিন্দের সমাধিস্থলে প্রগাঢ় ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করে। অন্তান্ত তীর্থস্থানের ন্যায় এখানে সর্ব্বদাই অনেক শিখ যাত্রীদের সমাগম হইয়া থাকে। গুরু গোবিন্দর প্রতি শিখ জাতীর এতাদৃশ ভক্তি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।

গুরুদেওয়ারা হইতে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে লালা পরমেশ্বরী দাসের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সুমধুর বচনে আমরা আপ্যায়িত হইলাম। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, অন্তঃকরণ তেমনই নির্ম্মল। তিনি আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের ন্যায় অমৃতসরের ঘৃত সুলভ ও উৎকৃষ্ট। অমৃতসরে মহিষের ঘৃত বা দুগ্ধ ভিন্ন গব্য ঘৃত বা দুগ্ধ পাওয়া গেল না। এ দেশে মৎস্যের ব্যবহার নাই। যাহারা মৎস্য ভক্ষণ করে, পঞ্জাবীরা তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। বঙ্গদেশে মৎস্যের প্রচলন বলিয়া তাহারা বাঙ্গালীকে বড় বিদ্রুপ করিয়া থাকে। মৎস্যের পরিবর্ত্তে পঞ্জাবে মাংস যথেষ্ট প্রচলিত। শীতকালে সকলেই রুটির সহিত দুই বেলা মাংস ভক্ষণ করে, নতুবা তাহারা শীতাতিশয্য সহিতে পারে না। আমরা এখানে "থারু" ও "আমানি" নামে ছোট ছোট দুই প্রকার ফল ভক্ষণ করিলাম। আমাদের মুখে ইহা ভাল লাগিল না, কিন্তু পঞ্জাবীরা ইহা সমাদরে ভক্ষণ করে। এ দেশে ছাগ ও কুকুরের দেহ ঘন লম্বা রোমে আবৃত থাকায় ইহাদিগকে বড় সুন্দর দেখায়। ছাগগুলি বঙ্গদেশের ছাগ অপেক্ষা অনেক বড়। ইহাদের এ প্রকার গাত্রাবরণ না থাকিলে শীতে মরিয়া যাইত। ঈশ্বরের কি অসীম দয়া! জীবন-ধারণের জন্য যাহার যাহা আবশ্যক তিনি তাহা দ্বারাই সকলকে রক্ষা করিতেছেন। একটু লক্ষ্য করিলে আমরা সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার যথেষ্ট করুণার

৬১]

পরিচয় পাইয়া থাকি; কিন্তু মোহান্ধ আমরা তাহা দেখিয়াও দেখি না।

দিবা দ্বিপ্রহরে এখানে গ্রীষ্মের প্রাথর্য্য বড় ভয়ানক। মধ্যাহ্ন সময় কঙ্করময় মৃত্তিকা এত গরম হয় যে পাদুকার আশ্রয় ভিন্ন কেহ মুক্ত-পদে হাঁটিতে সক্ষম হয় না। বঙ্গদেশের মৃত্তিকা নরম বলিয়া রথ-চক্র-মুখরিত ইষ্টক-বদ্ধ রাজপথে খোয়া পিটাইয়া রাস্তা মেরামত করা হয়; এ জন্য রাজপথ সর্ব্বত্রই লালবর্ণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবের কোন সহরের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ নহে, কারণ এই প্রদেশদ্বয়ের মৃত্তিকা এত শক্ত যে ইহা সর্ব্বদা মেরামত করিবার আবশ্যক হয় না, এবং দরকার হইলে খোয়ার পরিবর্ত্তে শুধু প্রস্তর-কণা দ্বারা রাস্তা সমান করা হয়।

আজ গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যু দিন। প্রতি বৎসর এই দিনে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়। ভাগ্যবশাৎ আজ আমরা অমৃতসহরে উপস্থিত থাকায় মেলা দর্শন করিতে পারিলাম। আমরা অপরাহ্নে দোকান হইতে লালা পরমেশ্বরীদাসের একটী কর্ম্ম-চারীকে সঙ্গে লইয়া তাহার সাহায্যে অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া মেলার ভিতর প্রবেশ করিলাম। মেলাতে

সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। এই প্রদর্শনীতে পুতুল, খেলানা ও অন্যান্য যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য দেখিলাম তাহা সমস্তই অমৃতসহরের তৈয়ারী। একটী দ্রব্যও ভিন্ন জেলার নহে; ইহা অমৃতসহরের পক্ষে গৌরবের বিষয় বটে। আমরা এ সকল স্বদেশী কারু-কার্য্য দেখিয়া অতীব আহ্লাদিত হইলাম।

প্রদর্শনীর সন্নিকটে বাবাসাহেবের মন্দির। গুরু-গোবিন্দ সিংহ বাবাসাহেব নামে খ্যাত। বলা বাহুল্য, মন্দিরে জুতা নেওয়া নিষেধ। মন্দিরাভ্যন্তরে একটী সভা বসিয়াছে; সভা-মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন নব্য-যুবক সমস্বরে গোবিন্দ সিংহের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতেছে, সভার এক পার্শ্বে প্রভাত-কমল-সদৃশ শত শত অনিন্দ্য সুন্দরী লাবণ্যময়ী পঞ্জাবী-ললনা তাহা নীরবে শ্রবণ করিতেছে। বড়ই অপূর্ব্ব দৃশ্য! অমৃত সরোবরস্থিত স্বর্ণ-মন্দিরের সঙ্গীতের ন্যায় এখানেও গুরুগোবিন্দ-সিংহের বিয়োগান্ত সকরুণ গীতি শ্রবণ করিয়া আমাদের চিত্ত বিমোহিত হইল। অর্থ না বুঝিলেও এ সকল সঙ্গীতের এমনই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে যে ইহা শ্রবণ করিলে আর স্থির থাকা যায় না; সহসা অতী-তের চিত্র-পট হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া প্রাণ

আকুল করিয়া তুলে। অর্থ না বুঝিয়াও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আমরাই যখন এত দূর মুগ্ধ হই, পঞ্জাবীর হৃদয়ে না জানি কত তরঙ্গ উঠে।

আমরা বাবাসাহেবের মন্দির দর্শন করিয়া মেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে গুরুনাথ সাহেবের মন্দির দর্শন করিলাম। অমৃত-সরোবরের স্বর্ণ-মন্দিরের ন্যায় ইহার চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত। মন্দিরটী বড়ই প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। গুরুনাথ সাহেব গুরুগোবিন্দ সিংহের উর্দ্ধতন পুরুষ।

আমরা সায়ংকালে বাসায় আসিলাম। সন্ধ্যার পর লালা পরমেশ্বরী দাসের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল এবং তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রের সহিত পরিচয় হইল। তাঁহারা রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নিজালয়ে চলিয়া গেলেন; আমরা আহারান্তে শয়ন-কক্ষে আশ্রয় লইলাম।

কলিকাতা হইতে সহস্র মাইল দূরে আসিয়াও জগদীশ্বরের অনুকম্পায় অমৃতসহরের বক্ষে সুখে নিদ্রা গেলাম। এখানে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা সত্বেও একটী বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইল—এ দেশের প্রথানুসারে ত্রিতল গৃহের মুক্ত ছাদের উপর আমরা পুরীশ উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহা আমাদের

নিকট বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইল। যুক্ত-প্রদেশের বিশেষতঃ পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানে এ নিয়ম প্রচলিত। আমরা হরিদ্বারেও এই অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য এই অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম, সহৃদয় পাঠক ক্ষমা করিবেন। অমৃতসহরে একটীও বাঙ্গালী দেখিলাম না। ১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে লালা পরমেশ্বরীদাসের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল না। আমরা তাঁহার কর্ম্মচারীদের নিকট বিদায় লইলাম। বরকৎরাম ও রণজয়রাম যে আমাদের জন্য নিস্বার্থভাবে সারাদিন খাটিয়াছে এ জন্য তাহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া আমরা ষ্টেসনে আসিলাম।

ইহারা সাধারণ এবং নিরক্ষর ব্যক্তি, তথাপি ইহাদের পরার্থপরতা দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। বড়ই দুঃখের সহিত লিখিতেছি, বঙ্গদেশে এরূপ সহানুভূতি অতি বিরল। বিদেশী লোক আসিলে আমরা তাহার জন্য কখনও এতটা শ্রম স্বীকার করি কি? এ বিষয়ে পঞ্জাব আদর্শ। শিক্ষা সম্বন্ধে পঞ্জাববাসী ভারতের সমস্ত প্রদেশের পশ্চাতে পড়িয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের হৃদয়ে পর-হিতৈষণা যেরূপ প্রবল-

বতী, তাহারা যখন সকলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, তখন তাহারা চরিত্র সম্বন্ধে ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। আমার সহিত শত শত পঞ্জাবীর পরিচয় হইয়াছে এবং তাহাদের সহিত সর্ব্বদা একত্রে বাস করিয়া তাহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা এত ভদ্র, বিনয়ী ও মিষ্টভাষী যে একজনের ব্যবহারেও অসন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। ক্ষমা, দয়া, সরলতা প্রভৃতি হৃদ-য়ের বৃত্তিগুলি যেন তাহারা অন্যান্য প্রদেশ হইতে কাড়িয়া লইয়াছে।

দেরাদুন হইতে যে মেল ট্রেণ লাহোরে যাইবে, সেই গাড়ীতে আমাদের যাইতে হইবে। গাড়ী আসার কিছু বিলম্ব দেখিয়া আমরা প্লাটফর্ম্মে বসিয়া আছি, এমন সময় একজন পঞ্জাবী পুলিশ আসিয়া আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল ও বলিল যে বাঙ্গালীর পঞ্জাবে আসার হুকুম নাই। তাহার এ ধারণা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়া আমাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য তাহাকে জ্ঞাপন করিলাম। সে নিরস্ত হইল। পঞ্জাবের পুলিশ অভদ্র নহে। তাহারা কর্ত্তব্য

কার্য্য পালনে সর্ব্বদা তৎপর, অথচ ভদ্রলোকের সম্মান রক্ষা করিতেও ব্যস্ত।

অমৃতসহর জংসন হইতে এক শাখা "পট্টি" ও অন্য শাখা গুরুদাসপুর জিলার তহসিল "পাঠানকোট" পর্য্যন্ত গিয়াছে। যাঁহারা হিমালয়ের বক্ষে বুকলো, দেলহৌসী, চম্বা, নুরপুর, কাঙ্গড়া, পালমপুর, ধর্ম্মশালা, মধুপুর প্রভৃতি স্বর্গোপম স্থান দর্শন করিয়া জীবন স্বার্থক করিবার জন্য বড় ব্যাকুল, তাঁহারা পাঠানকোট হইয়া যাইবেন। পাঠানকোটে যান বাহনাদির বন্দোবস্ত আছে।

আমরা ৭।৪২ মিনিটে অমৃতসহর হইতে রওনা হইলাম এবং "লাহোর-ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ইষ্ট" বা "মিয়ান্‌মীর-ইয়াস্‌" ষ্টেসন হইয়া ৯।৩০ মিনিটে লাহোর জংসনে উপনীত হইলাম। আমাদের বিশ্বাস ছিল দেরাদুন মেল লাহোর পর্য্যন্ত আসিয়াই থামে, আর যায় না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছি, এমন সময় পথিমধ্যে কয়েকজন ইউরেসিয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই ট্রেণ "লালামুসা জংসন" পর্য্যন্ত যাইবে। ইহা শুনিয়া আমরা পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া বসিলাম। লাহোর পঞ্জাবের রাজধানী

এই ষ্টেশন রাজধানীর উপযুক্ত। হাবড়া ষ্টেসনের পর এত বড় ষ্টেসন আর দেখি নাই। হাবড়ার ন্যায় এখানেও কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন প্লাটফরম্ আছে। এখানে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ সওয়া ঘণ্টা অপেক্ষা করে। এখান হইতে করাচী বন্দর পর্য্যন্ত একটী লাইন আছে। লাহোরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে দুইটী বৃহৎ দুর্গ আছে। সহরের চারিদিক প্রস্তর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। জাহাঙ্গীর প্রভৃতি মোগল বাদসাহেরা গ্রীষ্মকালে অধিকাংশ সময় লাহোরে অতিবাহিত করিতেন। এখানকার বিখ্যাত "সালিমার-উদ্যান" সাহাজান বাদসাহের অবিনশ্বর কীর্ত্তি। লাহোরের দুর্গ মধ্যে রণজিৎ সিংহের ভগ্ন রাজ-প্রাসাদ আজও দর্শকের হৃদয়ে পূর্ব্ব-গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়।

১০। ৪৫ মিনিটে ট্রেণ ছাড়িল। লাহোর হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে প্রসিদ্ধ রাভি নদী পার হইলাম। বৃহৎ পোলের উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে "Caution, speed not to exceed 10 miles an hour" আমরা ১১। ১২ মিনিটে "সাহাদারা-জংসনে" পৌঁছিলাম। এখান হইতে একটী শাখা-লাইন ওয়াজিরাবাদ-লায়ালপুর" লাইনের সহিত মিলিত হইয়াছে।

আমরা ১।৩৪ মিনিটে গুজরানওয়ালা জেলায় পৌঁছিলাম। এই জেলা লাহোর বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। এই ষ্টেসনটী মন্দ নয়। পঞ্জাবের অধিকাংশ ষ্টেসন বঙ্গদেশ এবং যুক্ত-প্রদেশের ষ্টেসন অপেক্ষা সুন্দর। আমরা গুজরানওয়ালা ছাড়াইয়া বেলা ২।৩০ ঘটিকার সময় "ওয়াজিরাবাদ" জংসনে উপনীত হইলাম। এখান হইতে লায়েলপুর ও খানেওয়াল হইয়া মুলতান পর্য্যন্ত এক লাইন গিয়াছে। ওয়াজিরাবাদ গুজারাণওয়ালা জেলার একটী তহসিল। এখানে গাড়ী বদল করিয়া জম্বু যাইতে হয় এবং এক প্লাটফরম্ হইতে অন্য প্লাটফরমে যাইতে উপরের সেতু পার হইয়া যাইতে হয়। কোন ট্রেণ ষ্টেসনে আসিলে উভয় পথের যাত্রীদের (যাহারা ট্রেণ হইতে নামিয়াছে এবং যাহারা ট্রেণে উঠিবে) সেই সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত সেতু দিয়া যাতায়াত করিতে বড় অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, অপিচ পুলের উপর টিকেট-কলেক্টার টিকিট চেক করাতে অধিকতর অসুবিধায় পড়িতে হয়। কারণ, ট্রেণ ছাড়িবার আশঙ্কায় অধীর আরোহীগণ যে যাহাকে পশ্চাৎপদ করিয়া অগ্রসর হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিয়া স্বীয় স্বীয় শারীরিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ফলতঃ

এখানে কিঞ্চিৎ বলের পরীক্ষা হয়। এখানে "জোর যার মুল্লুক তার"। আমরা দুর্ব্বল বাঙ্গালী, অতি কষ্টে সেই জন-সঙ্ঘ ভেদ করিয়া সেতু পার হইয়া ভিন্ন প্লাটফর্ম্মে আসিলাম। গাড়ী আসিবার কিছু পূর্ব্বে টিকেট চেক করার বন্দোবস্ত হইলে অথবা আরোহী-দিগকে গাড়ী আসিবার পূর্ব্বে প্লাটফর্ম্মে যাইবার অনুমতি দিলে কিম্বা উভয় যাত্রীকের যাতায়াতের বিভিন্ন পথ থাকিলে আর কাহারও এবম্বিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। নর্থ-ওয়েষ্টারণ-রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিত-মাত্রে এই সামান্য অসুবিধা দূর হইতে পারে। পঞ্জাবের সমস্ত ষ্টেসনেই বেশ সুন্দর শৃঙ্খলা আছে, কোন ষ্টেসনে এ রকম অসুবিধা নাই।

আমরা ৩।৫০ মিনিটে জম্মু রওনা হইলাম। গাড়ী ৫।২৫ মিনিটে "সিয়ালকোট" আসিল। সিয়ালকোট পঞ্জাবের সীমান্ত জেলা। এই জেলা পূর্ব্বে রাওলপিণ্ডি বিভাগের অন্তর্গত ছিল; এখন লাহোর বিভাগে ভুক্ত হইয়াছে। সিয়ালকোট ষ্টেসন ছাড়িয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে কাশ্মীরাধিপতির সীমায় উপনীত হইলাম। এই সীমান্ত স্থান সারাসারি প্রস্তর খণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। দৃশ্য বড় চমৎকার! যেন অগণিত

সৈন্যরাজি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অহর্নিশি দণ্ডায়মান থাকিয়া সীমান্ত দেশ রক্ষা করিতেছে। আমি বঙ্গদেশে ত্রিপুরাধিশ্বরের রাজ্যের সীমান্ত ভাগেও এরূপ অসংখ্য প্রহরী নিযুক্ত দেখিয়াছি।

সিয়ালকোট হইতে জম্মু পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইনের দুই পার্শ্বে অগণিত বৃক্ষশ্রেণী অবস্থিত। গাড়ী চলিবার সময় দুই ধারের বৃক্ষরাজির শোভা মনোহারিণী। ক্ষিপ্রগামী ট্রেণের বায়ু-সঞ্চালনে দুই পার্শ্বের বিকম্পিত তরুশ্রেণীর উদ্দাম-নৃত্য দেখিয়া মনে হইল, যেন তাহাদের অন্তর্নিহিত জীবন্তভাব বাহিরে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং ট্রেণের ক্ষিপ্র গতি সহ্য করিতে না পারিয়া হস্তপদ সঞ্চালন দ্বারা আন্তরিক যাতনা প্রকাশ করিতেছে। ইহাদের এ অবস্থা দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইল।

"মিরাণসাহেব" ষ্টেসন হইতে জম্মুর উপকণ্ঠস্থ পর্ব্বতমালার দৃশ্য পরম রমণীয়। আমরা যখন জম্মু পৌঁছিলাম, তখন সূর্য্যদেব সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া জম্মুর অনতিদূরবর্ত্তী তুঙ্গ পর্ব্বত শিখরে বিশ্রাম করিতেছেন।

আমরা সপ্ত দিবস গাড়ীতে বাস করায় (ইতিমধ্যে এক রাত্রি অমৃতসহর বাস করিয়াছি) নানা প্রকার

অনিয়মে আমাদের শরীর বড় দুর্ব্বল বোধ হইতেছিল সত্য, কিন্তু প্রাণের ভিতর কেমন একটু আনন্দানুভব করিয়াছি। প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন পল্লী, নূতন লোক, নূতন পরিচ্ছদ, নূতন ভাষা, নূতন আচার ব্যবহার— এ সকল ক্ষণে ক্ষণে নূতন সন্দর্শন করা কি সুখকর নহে? ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এ কয়েকদিন আমরা যেন কি এক অননুভূতপূর্ব্ব নূতন স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছি। রেলপথের দৃশ্য বড় চমৎকার! কেহ উঠিতেছে, কেহ নামিতেছে, আবার উঠিতেছে, সকলেই ছুটাছুটি করিতেছে—না জানি কি অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইবার আশায় সকলেই শশব্যস্ত— সকলেই উদ্বিগ্ন-চিত্ত। শান্তিদেবী এ স্থান হইতে চির-বিদায় লইয়াছেন। এক বেঞ্চে পাঁচজন আরোহী বসিয়া আছে, কয়েক ষ্টেসন পরে দেখা গেল তাহাদের একজনও নাই, রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা পরিবর্ত্তনের ন্যায় তাহাদের স্থান অন্যে অধিকার করিয়াছে। কত লোক উঠিতেছে, কত লোক নামিতেছে, কেহ কাহা-কেও জিজ্ঞাসা করিতেছে না; "কাকস্য পরিবেদনা"। কাহার সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই। এ কয় দিন গাড়ীতে বাস করিয়া সর্ব্বদা এই দৃশ্য নয়ন গোচর

হওয়ায় সংসারের খেলা এবং ক্ষণ বিধ্বংসী শরীরের অসারত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি হইল। মায়াবদ্ধ জীবের সর্ব্বত্র বদ্ধভাবই পরিলক্ষিত হয়। কয়েক দিবস গাড়ীতে অবস্থান করায় ইহা স্বীয় নিকেতন বলিয়া বোধ হইল। এখন আর গাড়ী ত্যাগ করিতে ভাল লাগে না। বুঝিলাম, ইহ-সংসারে যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, অভ্যাসবশতঃ তাহাই ক্রমে স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়।

গ্রীষ্মকালে পঞ্জাবের রেলপথে ভ্রমণ অতিশয় ক্লেশকর। পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া নিদারুণ গ্রীষ্মে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নকালে পঞ্জাবের মরুময় সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে দিয়া, উত্তপ্ত বায়ু-প্রবাহ ভেদ করিয়া ট্রেণ যখন নক্ষত্রবেগে চলিতে থাকে, তখন গাড়ী এত উত্তপ্ত হয়, যে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, কামরার বাহিরের কাষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিলে হস্তে ফোস্কা পড়ে। আমরা আরও একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছি—সমস্ত দিবসের দারুণ গ্রীষ্মে আমাদের পাদুকা এমন শুষ্ক ও সঙ্কুচিত হইয়াছে যে তাহা অপরাহ্নে কিছুতেই পরিধান করিতে পারি নাই। পাঠক, ভাবিয়া দেখুন ব্যাপারটা কি! পঞ্জাবের গ্রীষ্ম

১৩]

বঙ্গদেশের মত নহে। বঙ্গদেশের ন্যায় পঞ্জাবে শরীর হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হয় না। পঞ্জাব এমনই শুষ্ক প্রদেশ যে অগ্নিশিখাবৎ প্রখর সূর্য্য-রশ্মি ও উষ্ণ বায়ু-প্রবাহ শরীরকে সর্ব্বদা দগ্ধ করে; এবং বোধ হয় যেন আমরা নিরবচ্ছিন্ন অতি বৃহৎ আগ্নেয়-যন্ত্রে বাস করিতেছি।

বৃহৎ স্বার্থের কথা ছাড়িয়া দেই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই জগৎ মত্ত। তুচ্ছ এক হস্ত পরিমিত বসিবার স্থান লইয়া কত কলহ, কত মারামারি দেখিয়াছি, মধ্যে পড়িয়া কত লোকের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়াছি, পুনরায় আমাদের সহিত কত লোকের ঝগড়া হইয়াছে। ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ একটী সুন্দর জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছি—ভ্রমণে কাম ক্রোধাদি রিপুদল বড় নিস্তেজ থাকে। নিজালয়ে বসিয়া যে কথা শ্রুতিকটু বোধ হইয়াছে, প্রবাসে তদপেক্ষা অনুচিত বাক্য কেহ প্রয়োগ করিলে বাদানুবাদ করা নিস্প্রয়োজন মনে করিয়াছি। ঠেকিয়া যে নিরস্ত হইয়াছি তাহা নহে, কেমন যেন তিতিক্ষার ভাব আসিয়াছে। ফলতঃ যদি কেহ সুখ এবং শান্তি যুগপৎ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে চিরকাল কূপ-মণ্ডুকের মত গৃহে অবস্থান

না করিয়া উড্ডীয়মান বিহঙ্গের ন্যায় একবার বহির্জগতে ঝাঁপাইয়া পড়ুন, দেখিবেন আপনি যাহা আশা করিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর লাভবান হইবেন, কারণ এ বাণিজ্যে কেহ ক্ষতিগ্রস্থ হয় না।

"টাউই" ষ্টেসনের এক মাইল উত্তরে পর্ব্বতের সানুদেশে উন্নত প্রস্তরময় ভূভাগের উপর জম্বু অবস্থিত। জম্বু কাশ্মিরাধিপতির রাজধানী। উন্নত শস্য-শ্যামল উপত্যকার উপর গগনস্পর্শী মেঘপুঞ্জভেদী ভীমকায় পর্ব্বতের কোণে সৌধমণ্ডিত রাজবর্ত্ম ভূষিত জম্বু নগরীর শোভা জগতে অতুলনীয়া।

আমরা ষ্টেসনের বহির্ভাগে আসিবামাত্রই কাশ্মীর-গবর্ণমেণ্টের দুইজন অফিসার আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা পুনঃপুনঃ বলা সত্ত্বেও তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। পরিশেষে কোন প্রকারে আমার সঙ্গীর লোকের নাম ও বাড়ী লিখিয়া বলিলেন যে এ স্থানে ভিন্ন দেশের লোক আসিলে তাহার পরিচয় লিখিয়া লওয়া হয়।

আমরা অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইয়া "টাউই নদী" প্রাপ্ত হইলাম। নব-যৌবনসম্পন্না ক্ষীপ্র-সলিলা "টাউই" জম্বুর পাদমূল চুম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই

নদীর উপর একটী সুন্দর সেতু আছে। সেতুর দুই পারে মহারাজার কর্ম্মচারী আছেন। সেতু পার হইতে একটী পয়সা দিতে হয় এবং তাহার চিহ্নস্বরূপ কর্ম্মচারীর নিকট হইতে কার্ড লইয়া পর পারের কর্ম্মচারীকে দিতে হয়। উভয় দিকে এই বন্দোবস্ত আছে।

আমরা সেতু পার হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে অনেক সরাই দেখিলাম। এই সরাই মধ্যে পথিকের থাকার এবং আহারাদি করিবার সুবিধা আছে। আমাদিগকে কেহ কেহ এখানে থাকিতে অনুরোধ করিলেন বটে, কিন্তু আমাদের তত প্ররৃত্তি হইল না। কারণ "ভিন্ন রুচি হি লোকঃ।" আমরা রঘুনাথজীর মন্দিরে বাস করিব ঠিক করিলাম। সরাই ছাড়াইয়া কিছু দূর আসিলে দুর্গ দেখা গেল। এই দুর্গটী বড়ই প্রাচীন। জম্বু হইতে তিন মাইল দূরে বর্ত্তমান "ম্যান্তোয়ারী দুর্গ" অবস্থিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জম্বু নগরী সমুন্নত ভূভাগ বা বৃহৎ টিলার উপর নির্ম্মিত। আমরা সমতল ভূমি ছাড়াইয়া সহরে প্রবেশ করিলাম। সহরে উঠিয়া কয়েক পা হাঁটিলেই রঘুনাথজীর মন্দির দেখা গেল। পথিকমাত্রেই এই মন্দিরে আশ্রয় পায়। অতএব সর্ব্ব সাধারণের ন্যায় আমরাও সমাদৃত হইলাম।

মন্দিরের সম্মুখে একটী সুন্দর পরিষ্কৃত স্থানে এক জন উষ্ণীষধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমরা তাঁহাদের সম্মুখীন হইলে উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জনৈক ভদ্র-লোকের প্রতি আমাদিগের বাসস্থান নির্ণয়ের ও আহা-রাদির ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে ও সদালাপে আমরা প্রীত হইলাম। কাশ্মীরাধিপতি এই মন্দিরের সমস্ত বিষয়ের কার্য্যভার ইঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। এই মন্দিরে একটী সংস্কৃত স্কুল আছে। ইঁনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষ। ইঁনি ছাত্রগণকে বেদ পড়ান, এজন্য ইঁহাকে বেদপাঠী কহে।

আমরা বেদপাঠীর সহিত কথোপকথন করিতেছি এমন সময় একটী বালক সহসা ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকার শুনিয়া আমরা সকলে দৌড়িয়া গিয়া দেখিলাম তাহাকে বৃশ্চিকে দংশন করিয়াছে এবং দারুণ যন্ত্রণায় সে কর্ত্তিত ছাগের ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। অনেক চেষ্টার পর সে একটু সুস্থ হইলে আমরা পুনরায় বেদপাঠীর নিকট আসিলাম। তিনি সায়ংকালের আরতি-ক্রিয়া সম্পন্ন

করাইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। আমরা মন্দিরে আশ্রয় লইলাম।

এই সংস্কৃত স্কুলকে একটী বৃহৎ টোল বলা যাইতে পারে। এখানে ছাত্রদের বাসস্থানের জন্য কোন ছাত্র নিবাস নাই, এবং টেবিল চেয়ার প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত কোন স্কুল-গৃহও নাই। এখানে প্রাচীন পদ্ধতি প্রচলিত। ছাত্রেরা সকলেই শিক্ষক বা গুরুর সহিত এক গৃহে বাস করে। প্রত্যেক শিক্ষকের ভিন্ন ভিন্ন ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ আছে। ছাত্রেরা সর্ব্বদা গুরুর পরিচর্য্যা করে এবং গুরু ও ছাত্রের কায়িক ও মানসিক উন্নতি-কল্পে বিশেষ মনোযোগী। গুরু শিষ্যের এবম্বিধ ভাব বড়ই মধুর। বৃহৎ মন্দিরের মধ্যে—পার্শ্বে ও বাহিরে সকলে ইষ্টকবদ্ধ মেঝের উপর স্থানে স্থানে আসন পাতিয়া বসিয়া প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করে। ইহাই তাহাদের স্কুল। পাঠক, দেখুন প্রাচীন নিয়ম প্রণালী কেমন সরলতাব্যঞ্জক, পবিত্র ও স্বর্গীয়! পাঠ্য-জীবনে ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস অতীব আবশ্যক, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণকার বালকেরা বোর্ডিংএ থাকিয়া অদ্ভুত বিলাসিতা উপভোগ করিয়া থাকে, পূর্ব্বে গুরু-

কুল বাসীদিগকে ইহার পরিবর্ত্তে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইত।

এখানে প্রাচীন নিয়ম অনুষ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইলাম, মনে বড় আশার সঞ্চার হইল। মন্দিরের মধ্যে রাম সীতার মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এতদ্ভিন্ন কয়েকটী শিবলিঙ্গ ও সহস্রাধিক শাল-গ্রাম শীলা রহিয়াছে। এক স্থানে এত শালগ্রামের সমাবেশ আর কোথাও দেখি নাই। মন্দিরের দ্বারে একটী বৃহৎ হনুমান মূর্ত্তি আছে। এত বড় মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায় না।

অন্ন বাঙ্গালীর প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য। অন্ন অপেক্ষা প্রিয়তর খাদ্য বাঙ্গালীর আর কিছু নাই। অন্ন বাঙ্গা-লীর প্রাণ। শস্য-শ্যামলা নদী মেখলা হরিত-পীত শোভিতা শস্পাচ্ছাদিতা চির-সৌন্দর্য্যময়ী বঙ্গ-জননীর ক্রোড়দেশ পরিত্যাগের সহিত বাঙ্গালীর সুখসেব্য খাদ্য,—অমৃতোপম অন্ন এক প্রকার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। যুক্তরাজ্য এবং পঞ্জাবে কচিৎ কোথাও অন্ন মিলিয়াছে, কারণ এ সকল প্রদেশে সর্ব্বদাই গমের আটা ব্যবহৃত হয়। হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীদের ধারণা এই, চাউল পুষ্টিকর খাদ্য নহে এবং ইহার ক্রিয়া ক্ষণস্থায়ী

এই ধারণা অহেতুকী নহে। তাহাদের এই সংস্কার তাহাদের জল বায়ুর সম্পূর্ণ উপযোগী। কারণ, তাহাদের দেশ বঙ্গভূমির ন্যায় চির-অস্বাস্থ্যকর নহে। রোগের জীবন্ত প্রেত মূর্ত্তি তাহারা দেখিতে পায় না। তাহাদের দেশের জল বায়ু এমন মনোহর যে দীর্ঘকাল বাস করিলে বঙ্গীয় অনেক ব্যাধি ঔষধ ব্যতিরেকে আরোগ্য হইয়া যায়। আবহাওয়ার গুণে তাহাদের ভুক্ত দ্রব্য অতি সহজে জীর্ণ হয়। তাই তাহাদের ব্যবহৃত এক পোয়া ওজনের অর্দ্ধ ইঞ্চি পুরু এক এক খানা হাতি মার্কা রুটী ব্যতীত বাঙ্গালার সহজ, সুপাচ্য, সুখসেব্য সরু চাউলে তাহাদের গাল পূর্ণ হইবে কেন? ইহা তাহাদের নিকট গণ্ডুষ পানের ন্যায় অনুমান হয়, এবং ইহা পাকযন্ত্রে পৌঁছিবামাত্র ভস্ম হইয়া যায়। এবম্বিধ কারণে ইহারা বিদ্রুপ করিয়া সুচিক্কণ অন্নে পরিপুষ্ট সুকোমল দেহ-বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে "কুল বাবু" (Foppish) আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এখানে মুগ দাল ভক্ষণ করিলাম। এত বড় মুগ বঙ্গদেশে নাই। কেহ না বলিয়া দিলে ইহা মুগ বলিয়া বুঝা যায় না। ইহা পঞ্জাবে উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের স্বাস্থ্য

এমন চমৎকার যে এই দাল ভক্ষণ করিয়া আমাদের কোন অসুখ হইল না। আমাদের দেশে এই দাল ভক্ষণ করিলে হয়ত বিসূচিকাগ্রস্ত হইয়া যম মন্দির দর্শন করিতে হইত। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে ভুক্তবস্তু যেন কি এক অমোঘ মন্ত্রবলে কোথায় উড়িয়া গেল! যুক্তরাজ্যে ও পঞ্জাবে গ্রীষ্মকালে গৃহে শয়ন করিবার প্রথা নাই। প্রখর গ্রীষ্ম বিধায় সকলেই গৃহের বাহিরে খাটুলিতে শয়ন করে। গৃহে শয়ন না করিবার অন্যতম কারণ বৃশ্চিক দংশন। আমরা প্রাঙ্গনে শয়ন করিলাম।

আমরা ১১ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া নগর দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। প্রায় চতুর্দ্দিক পর্ব্বত বেষ্টিত উচ্চ ভূমির উপর নগর নির্ম্মিত হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক সমাবেশ অতি সুন্দর দেখা যায়। রাজপথ অগণিত বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা পরিষ্কার-রূপে গ্রথিত। পরন্তু নগ্নপদে হাঁটিলে আঘাত লাগে না। আমি অভিলাষানুরূপ অর্দ্ধ মাইল নগ্নপদে হাঁটি-লাম। অভ্যাস না থাকায় প্রতি পাদ বিক্ষেপে একটু অসুবিধা বোধ হইল কিন্তু পদস্খলন হইল না। উত্তর ভারতের অন্য কোন সহরে এ রকম রাস্তা দেখি নাই।

মহারাজার সুরম্য হর্ম্ম্য জম্বুর প্রধান দর্শনীয় সামগ্রী। চতুষ্কোণ মণ্ডিত বিশাল অট্টালিকা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভিতরের প্রাঙ্গণ এত বড় যে তাহাতে অনায়াসে ফুটবল, ব্যাটবল ইত্যাদি ক্রীড়া সম্পন্ন হইতে পারে। মহারাজ এই বৈজয়ন্ত ধামে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। স্কুল, ডাকঘর, হাঁসপাতাল প্রভৃতির দৃশ্য মন্দ নহে।

আমরা মধ্যাহ্নকালে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এই মন্দিরে দেব-সেবা, অতিথি-সৎকার ও সংস্কৃত স্কুলের উন্নতি-কল্পে কাশ্মীরাধিপতি প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করেন। এখানে দৈনিক শতাধিক লোক আহার করে। স্কুলের ছাত্রদের সংস্কৃতে বেশ অনুরাগ আছে। তাহারা সর্ব্বদা সংস্কৃতানুশীলনে আমোদ বোধ করে। শিক্ষক ও ছাত্র, আহারে বিহারে সর্ব্বক্ষণ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করে।

তাহাদের দেব ভাষার প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ দর্শনে আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম। আমি সংস্কৃতানভিজ্ঞ হইলেও আমার ভাষা কেহ বুঝিতে পারে না বলিয়া আমাকে সকল সময় কোন প্রকারে সংস্কৃতে আলাপ করিতে হইত। ইহাতে কেহ মনে করিবেন না এ দেশের ভাষা

সংস্কৃত। আমি সংস্কৃত অধ্যয়নকারী ছাত্রদের সহিত একত্রে অবস্থান করিতাম বলিয়া আমাকে দেব-ভাষা ব্যবহার করিতে হইত। এ দেশের প্রচলিত ভাষা পঞ্জাবী।

এ দেশের লোক সরল, মিষ্টভাষী ও পরহিতৈষী। স্কুলের ছেলেদের ত কথাই নাই। তাহারা আমাদিগকে পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিল। স্কুলের পাঠ সমাপনান্তে অবকাশ সময়ে তাহারা আমাদের সমীপস্থ হইয়া আলাপনে মুগ্ধ থাকিত। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বালকেরা কেহ বাঙ্গালী মনুষ্য দর্শন করে নাই। আমরা তাহাদের চক্ষে নূতন দৃশ্য। কোন নূতন জীব দর্শন করিলে আমরা যেরূপ উৎফুল্ল হই, তাহারা আমাদিগকে দর্শন করিয়া ততোধিক আনন্দিত হইল। তাহারা ঔৎসুক্য সহকারে নির্নিমেষ নেত্রে আমাদিগের অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বাক্য-স্ফুরণ, হস্তপদ বিক্ষেপ প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিত। বালক-সুলভ চপলতায় প্রণোদিত হইয়া কেহ আমাদের সহিত হাস্য কৌতুক করিত, কেহ গল্প করিত কেহ বা শুধু চাহিয়া দেখিতেই ভালবাসিত। অনুসন্ধিৎসু বালকবৃন্দ বঙ্গদেশের বিষয় সংস্কৃত ভাষায় আমাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া

তুলিত। আমিও অবিলম্বে সাধ্যমত তাহাদের প্রশ্নোত্তর করিতে বড় আমোদ বোধ করিতাম। বালকের স্বভাব কাহারও অবিদিত নাই—চতুর্দ্দিক হইতে দশমুখে প্রশ্ন হইত, উত্তর দিতে বিলম্ব হইলে কেহ আবদার করিয়া পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিত, আবার কেহ হয়ত অভিমান করিয়া বসিত। বালকের অভিমান কতক্ষণ? একটু আদর করিলে একেবারে গলিয়া যাইত। আমি তাহাদিগকে লইয়া এই আনন্দে বিভোর ছিলাম। তাহাদের বাল্যভাব এমনই স্বর্গীয়, এমনই অমৃত-সদৃশ যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তাহাদের পরমাত্মীয় হইলাম। আমাদিগকে ছাড়িয়া তাহারা দু'দণ্ডও থাকিতে ভালবাসিত না। প্রিয় পাঠক! যদি কেহ স্বর্গ দেখিতে বাসনা করেন তবে শিশুর অন্তঃকরণে প্রবেশ করুন। তাহাদের দেহ স্বর্গভূমি, বাক্য স্বর্গ সুধা, হৃদয়ে নন্দন-কানন, মন মন্দাকিনী এবং প্রাণ স্বর্গের দেবতা। বলিতে কি, আমি বালকদিগের সহিত যে দুই দিন একত্রে অবস্থান করিয়াছি, পৃথিবীর কোন চিন্তা আমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাহারা আমাকে এমন করিয়া ভুলাইয়াছিল যেন আমি কি এক পীযূষ পানে আত্মহারা হইয়া রহিয়াছিলাম।

একটী রহস্যোদ্দীপক কথা লিখিতেছি। জম্বু নগ-রীতে জনসাধারণের বিশ্বাস, বঙ্গবাসী মন্ত্রবলে বলীয়ান্ এবং মায়া-বিদ্যায় চিরাভ্যস্ত। বাঙ্গালী মুহূর্ত্তে মানবকে পশু এবং পশুকে মনুষ্যে পরিণত করিতে পারে। এই অন্ধ-বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে এমন দৃঢ়বদ্ধ যে কোন যুক্তি দ্বারা তাহাদের এই ভ্রম দূর করা গেল না। বালক-সম্প্রদায় আমাকে একেবারে বেষ্টন করিয়া বসিল,—তাহাদিগকে মায়া-বিদ্যা শিখাইতে হইবে। আমি পারিব না বলিলে ছাড়ে কে? আমি জানি না বলিলে শুনে কে? বালকের আবদার বড় শক্ত। সমস্ত উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু বালকের আবদার রক্ষা না করিয়া উপায় নাই। সপ্তরথী-বেষ্টিত হইয়া আমি এক বিষম সমস্যায় পড়িলাম। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর তাহা-দিগকে এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলাম যে, দীক্ষাগ্রহণ না করিলে যাদুমন্ত্রে অধিকার হয় না, আমি অদীক্ষিত অতএব আমি এ কার্য্যে অধিকারী নই। ইহা বলিয়া আমি আশু নিষ্কৃতিলাভ করিলাম। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী যাদু-বিদ্যা জানে না, এ কথা তাহাদিগকে বিশ্বাস করাইবে কাহার সাধ্য?

পাঠক! বঙ্গদেশ হইতে প্রায় দেড় হাজার মাইল

ব্যবধানে—সুদূর জম্বু নগরীতে একটী বাঙ্গালীর চরিত্র পাঠ করুণ। জ্যৈষ্ঠ মাস, দারুণ গ্রীষ্ম। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়। গ্রীষ্মাতিশয্যে যাবতীয় প্রাণী ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আমরা একটী বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া দাক্ষিণাত্য-নিবাসী বেদাধ্যয়নকারী এই স্কুলের একজন অধিক বয়স্ক ছাত্রের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছি, ইত্যবসরে আমার সঙ্গীয় লোক সিগারেট্‌ ক্রয় করিবার ব্যপদেশে আমার ব্যাগ হইতে আমার অজ্ঞাতসারে পঁয়ত্রিশটী রৌপ্য মুদ্রা লইয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিল। আমার সন্দেহ করিবার কোন কারণ ছিল না, অতএব আমি প্রথমতঃ সন্দিহান হই নাই, কিন্তু তাহাকে অধিকক্ষণ অনুপস্থিত দেখিয়া আমি ও দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ একটু উদ্বিগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী কোন স্থানে তাহাকে না পাওয়ায় সন্দেহ ক্রমে গাঢ়তর হইল। আমরা দুইজনে একাগাড়ী করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে "টাউই" উপনীত হইলাম। তখনও ট্রেণ ছাড়ে নাই। ষ্টেসনের একজন কর্ম্মচারী বলিলেন যে তিনি কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একজন অল্প বয়স্ক বাঙ্গালী যুবককে এখানে দণ্ডায়মান দেখিয়াছেন, কিন্তু সে কোথায় গিয়াছে তাহা তিনি জ্ঞাত

নহেন। ট্রেণ ছাড়িবার সময় হইলে আমরা প্রত্যেক কামরায় তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া স্থির করিলাম,—এই পর্ব্বত-সঙ্কুল নগরীতে প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে গুপ্তভাবে লুকাইত থাকা সহজ-সাধ্য নহে। সে ধৃত হইবার আশঙ্কায় টাউই হইতে তিন মাইল দূরে পরবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেসন "সাতওয়ারী ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট" হাঁটিয়া গিয়াছে; তথা হইতে ট্রেণে উঠিবে। টাউই হইতে রেলপথে ভিন্ন লাইনে যাইতে হইলে ওয়াজিরাবাদ জংসন ভিন্ন যাওয়ার দ্বিতীয় রাস্তা নাই। ওয়াজিরাবাদ পুলিশকে তারযোগে সংবাদ দিয়া তাহাকে ধৃত করিবার জন্য আমাকে অনেকে অনুরোধ করিলেন, আমি কিছুতেই স্বীকৃত হইলাম না। কারণ সে মাত্র কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, অতএব অপ্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং ক্ষমার্হ।

আমার অজ্ঞাতসারে আমার নিকট হইতে বিদায় লইবার তাহার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাই নাই, তবে জম্বুতে প্রবেশ করিয়াই জম্বুর পর্ব্বত দেখিয়া সে ভীত হইয়াছিল এবং আমি এই পার্ব্বত্য-পথে কাশ্মীর গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় সে আপত্তি করিয়াছিল; এবং এ স্থানের প্রখর গ্রীষ্ম তাহার অসহনীয়

হইয়াছে, ইহাও আমাকে জানাইয়াছে। যে কারণেই হউক সে নিষ্ঠুরের মত আমাকে ছাড়িয়া গেল। আমাকে প্রকাশ্যে বলিয়া গেলে আমি তাহাকে হৃষ্টচিত্তে বিদায় করিতাম। এই অবস্থায় বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দ-চন্দ্র দাসের "বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়" কবি-তাটী স্মৃতিপথে উদিত হইল। সে আমার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। বলা বাহুল্য, তাহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমি নিজে বহন করিয়া তাহাকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

আমি টাউই হইতে ক্ষুণ্ণমনে, ভগ্নোৎসাহে রঘুনাথ-জির মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ঘটনাটী ক্রমে চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল। যে শুনিল সে তাহাকে শত মুখে নিন্দা করিল এবং কেহ কেহ বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিতে ত্রুটী করিল না, কারণ অতি দূরদেশে সাধারণতঃ একের চরিত্র দ্বারা সমগ্র জাতির বা দেশের চরিত্র অনুমিত হইয়া থাকে, ইহা স্বভাবিক। বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতি একটু কলঙ্ক-রেখা পড়ায় আমি নগর-বাসীদিগের নিকট নিতান্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইলাম। আমার এখানে আর কাল বিলম্ব করিতে ইচ্ছা হইল না; পর দিবস অতি প্রত্যূষে এই স্থান ত্যাগ করিব সঙ্কল্প করিলাম।

পঞ্জাবের পর্ব্বতসঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া অভ্রভেদী হিমালয়ের দুরারোহ অগণিত শৃঙ্গাবলী আরোহণ করিয়া সুদূর ভূস্বর্গে বা কাশ্মীরে উপনীত হইবার পাঁচটী বিখ্যাত দুর্গম রাস্তা আছে; সেই সকল দুর্গম পথ এবং তাহাদের প্রধান প্রধান চটি বা আড্ডা ও দূরত্ব নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) ঝিলেম উপত্যকা-পথ—রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর; ভায়া মরি, কোহালা ও বারামুল্লা; ব্যবধান ২০০ মাইল।

(২) বাণিহাল-পথ—টাউই ষ্টেসন (জম্বু) হইতে শ্রীনগর; ভায়া চেনাব-উপত্যকা এবং ইছ্‌লামাবাদ ব্যবধান ১৬৩ মাইল।

(৩) পঞ্চপথ—ঝিলেম সহর হইতে শ্রীনগর ভায়া পঞ্চ-উপত্যকা; ব্যবধান ১৯৮ মাইল।

(৪) পঞ্জর পথ—রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর; ভায়া পঞ্চ-উপত্যকা এবং ঝিলেম-উপত্যকা; ব্যবধান ১৮০ মাইল।

(৫) আবটাবাদ-পথ—হাসান আব্‌দাল্ হইতে শ্রীনগর; ভায়া হাজারা জেলা এবং আপার ঝিলেম উপত্যকা; ব্যবধান ১৯৮ মাইল।

(১) ঝিলেম উপত্যাকা-পথ।

চটির নাম।	দূরত্ব।
১। রাওলপিণ্ডি	
২। মরি	৩৮ মাইল
৩। কোহালা	২৬ "
৪। ডুলাই	১২ "
৫। ডোমেল্	১০ "
৬। গার্হি	১৩ "
৭। হট্টি	১১ "
৮। চগোটি	১৪ "
৯। উরি	১৩॥ "
১০। রামপুর	১৩॥ "
১১। বারামুল্লা	১৫ "
১২। শ্রীনগর	৩৪ "
	২০০ মাইল।

(২) বাণিহাল-পথ।

চটির নাম।	দূরত্ব।
১। জম্বু (টাউই)	
২। নাগ্রোটা	৬ মাইল

৩।	দান্‌শাল	১১ মাইল
৪।	উদেমপুর	১২ "
৫।	ড্রুমতল	১৫ "
৬।	বাটোলি	১৩ "
৭।	রামবাঁধ	১৪ "
৮।	রামস্থ	১৯ "
৯।	দিওগল্	১২ "
১০।	ভারনেগ্	১২ "
১১।	ইছলামাবাদ	১৬ "
১২।	শ্রীনগর	৩৩ "
		১৬৩ মাইল।

(৩) পঞ্চ-পথ।

চটির নাম		দূরত্ব।
১।	ঝিলেম	
২।	জুলিয়াল্	১৪ মাইল
৩।	টেঙ্গ্রুট্	১৪ "
৪।	চৌমুখ্	১০ "
৫।	বিয়ারি	৭ "
৬।	সেন্দার্	১৪ "

৭।	কোট্‌লি	১৫ মাইল
৮।	সেইরা	১৪ ”
৯।	পঞ্চ	১৬ ”
১০।	কৌটা	১০ ”
১১।	আলিয়াবাদ	৮ ”
১২।	হায়দ্রাবাদ	৮ ”
১৩।	উরি	১০ ”
		১৪০ মাইল।

উরিতে ঝিলেম উপত্যকা পথের সহিত এই পথ সম্মিলিত হইয়াছে; (১) উপরে দেখ।

(৪) পঞ্জর-পথ।

	চটির নাম	দূরত্ব
১।	গুজরাট	
২।	ভীমবার্‌	২৯ মাইল
৩।	সয়দাবাদ	১৪ ”
৪।	নাওসেরা	১৩ ”
৫।	চাঙ্গাসরাই	১৪ ”
৬।	রাজাত্রি	১৪ ”
৭।	থানামণ্ডি	১৪ ”

৮।	বারামূগল্লা	১১ মাইল
৯।	পসিয়ানা	১০ ”
১০।	আলিয়াবাদ সরাই	১১ ”
১১।	হিরপুর	১২ ”
১২।	সুপিয়ান্	৮ ”
১৩।	রামু	১২ ”
১৪।	শ্রীনগর	১৮ ”
		১৮০ মাইল

এই পথে থানামণ্ডি হইতে সুপিয়ান্ পর্য্যন্ত আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময় বরফে আবৃত থাকে। থানামণ্ডি হইতে ভায়া "সুরাণ" পঞ্চ-পথে মিলিত হইবার রাস্তা আছে। পঞ্চ পথের "পঞ্চ" হইতে "সুরাণ" ১৪ মাইল এবং থানামণ্ডি হইতে ১৬ মাইল। (৩) উপরে দেখ।

(৫) আবটাবাদ পথ।

চটির নাম।		দূরত্ব।
১।	হাসান্ আবদাল্	
২।	হরিপুর	২০ মাইল
৩।	আবটাবাদ	২০ ”

৪।	মানসেরা	১৬ মাইল
৫।	গার্হি হবিবুল্লা	১৬ "
৬।	ডোমেল	১৩ "
		৮৫ মাইল

ডোমেলে ঝিলেম-উপত্যকা-পথের সহিত এই পথ মিলিত হইয়াছে। (১) উপরে দেখ।

বাণিহাল-পথে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। যাঁহারা এই পথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কাশ্মীর ষ্টেট কৌন্সিলের বিশেষ অনুমত্যানুসারে অগ্রসর হইবেন। এই পথে অশ্বারোহণ ব্যতীত গাড়ির বন্দোবস্ত না থাকায় আমি ঝিলেম-উপত্যকা-পথে কাশ্মীর যাওয়া মনস্থ করিলাম। রাত্রিকালে প্রাঙ্গনে একটী বৃক্ষতলে আমি একাকী শয়ন করিলাম। বৃক্ষতলে একাকী রাত্রিবাস জীবনে এই প্রথম। এই এক নূতন সুখ। ১২ই জ্যৈষ্ঠ উষাকালে উঠিয়া দেবালয় প্রণাম করিয়া সঙ্গহীন, একাকী অবলম্বন-শূন্য হইয়া আমি জম্বু ত্যাগ করিলাম। তখন রঘুনাথজীর মন্দিরে কেহ কেহ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেছেন। বালকেরা প্রায় সকলেই নিদ্রিত ছিল, দুই একটী

বালকের সহিত দেখা হইল। তাহারা কিয়ৎ দূর আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিতে বড় কষ্ট হইল।

টাউই ষ্টেসনে আসিয়া রাওলপিণ্ডির টিকেট লইলাম। টাউই হইতে রাওলপিণ্ডি ১৯২ মাইল, ভাড়া ২৲ টাকা। ৭টা ৩০ মিনিটে গাড়ী ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতের নৈসর্গিক দৃশ্য ক্রমে আকাশের গাত্রে মিশিয়া গেল। আমার কামরায় তিনজন পঞ্জাবী ছাত্র উঠিয়াছিল, তাহারা সকলেই ন্যূনাধিক শিক্ষিত। পঞ্জাবের শিক্ষা বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তার পর তাহারা কৌতূহল বশতঃ আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া রাখিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সিয়ালকোট ষ্টেসনে গাড়ী আসিলে দুইটী ছেলে অবতরণ করিল। একটী মুসলমান ছাত্র গাড়ীতে রহিল। ইঁহার বাড়ী গুজরান্‌ওয়ালা জেলার অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে। ইঁনি ওয়াজিরাবাদ জংসনে গাড়ী বদল করিয়া পঞ্জাব-দিল্লী মেলে গুজরান্‌ওয়ালা যাইবেন। ইঁনি এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন। ইঁহার চেহারা যেমন সুন্দর, চরিত্র তেমনই নির্ম্মল। ইঁহার মধুর আলাপে আমি তৃপ্ত হইলাম। ইঁনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমি

বড় জংসন। এখান হইতে কুণ্ডিয়ান জংসন হইয়া সিন্ধু-তীর দিয়া বরাবর "সের সাহা" পর্য্যন্ত যে লাইন গিয়াছে তাহাকে "সিন্ধু-সাগর-শাখা-লাইন" কহে। লালা-মুসা হইতে মেল গাড়ী ১২।৩ মিনিটে "ঝিলেম" ষ্টেসনে আসিল। ঝিলেম রাওলপিণ্ডি বিভাগের অন্তর্ভূক্ত একটি জেলা। সুবিস্তৃতা ঝিলেম নদীর উপর ঝিলেম সহরের দৃশ্য মনোহর। কাশ্মীর দর্শনেচ্ছু পঞ্চ-পথের যাত্রী এই ষ্টেসন হইতে পার্ব্বতীয় পথে রওনা হইবেন। সিন্ধুনদ পঞ্জাবকে পাঁচ শাখায় বিভক্ত করিয়াছে। এই নদীগুলির মধ্যে ঝিলেম সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঝিলেম নদীর উপরের সেতু পঞ্জাবের প্রধান দর্শনীয়। এত বড় সেতু পঞ্জাবে আর নাই। ধীরে ধীরে সেতু পার হইয়া ট্রেণ পুনরায় ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিল। যুক্ত-রাজ্য এবং পঞ্জাবের মধ্য দিয়া যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহার মধ্যে পাহাড়ের ভিতর দিয়া ট্রেণ যায় নাই। ঝিলেম নদী পার হইলে পাহাড় দেখা গেল। এবার পাহাড়ের মধ্যে দিয়া গাড়ী চলিল। ক্রমে দুইটী ছোট ছোট টনেলের মধ্যে দিয়া ট্রেণ চলিয়া গেল। যুবক-জীবনে এই প্রথম টনেলের বিভীষিকা দেখিলাম। এখন আর দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর নাই; দুই দিকে

কেবল পর্ব্বতমালা। হঠাৎ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতাকীর্ণ প্রদেশে প্রবেশ করায় মনটা যেন কেমন হইল,—পর্ব্বতের রুক্ষতা ভাল লাগিল না। কারণ এ অঞ্চলের অধিকাংশ পর্ব্বত পাদপহীন। একে পঞ্জাবের মহাগ্রীষ্ম, তাহাতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে আগ্নেয়-গিরির ন্যায় উত্তপ্ত পাদপহীন পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে বিদ্যুৎবেগে ট্রেণ চলিয়া গেলে অর্দ্ধ দগ্ধ আরোহীদের যে কি শোচনীয় অবস্থা হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবে কি? মাঝে মাঝে দুই একটী মরু-পাহাড় দেখা গেল, ইহাতে একটীও বৃক্ষ লতা নাই, দৃশ্য ভয়ঙ্কর অথচ মনোহর। ইহাও জীবনে নূতন সন্দর্শন। এ সকল দেখিতে পাইব ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই; ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় কি না হয়! পঞ্জাবের পাহাড় কাটিয়া রেল-পথ বাহির করা হইয়াছে; রাস্তা অসমতল। ট্রেণখানা পাহাড়ের গা দিয়া কখনও উচ্চে, কখনও নিম্নে, পর্ব্বতের বঙ্কিম ব্যবচ্ছেদে হেলিয়া দুলিয়া সর্পাকারে চলিতে লাগিল। এ দৃশ্য রমণীয়। পর্ব্বতের ভিতর দিয়া এইরূপ ৭০।৮০ মাইল যাইয়া অপরাহ্ণ ৩।৩৪ মিনিটে আমরা "রাওলপিণ্ডি-ক্যান্টনমেণ্টে" উপনীত হইলাম।

রাওলপিণ্ডি পঞ্জাবের একটী বিভাগ। এখান হইতে "গোল্‌রা" জংসন হইয়া কোহাট জেলা দিয়া "থাল" পর্য্যন্ত একটী শাখা-লাইন বিস্তৃত রহিয়াছে। রাওল-পিণ্ডি রেলওয়ে ষ্টেসন দেখিতে বড় সুন্দর, ইহার চূড়া প্রটেস্‌ট্যাণ্ট গির্জ্জার চূড়ার মত। এই নমুনার ষ্টেসন আর দেখি নাই। নর্থ-ওয়েষ্টারণ্‌-রেলওয়ে কোম্পানির সমস্ত ষ্টেসনই সুন্দর, একটীও নিন্দনীয় নহে; রাওলপিণ্ডির ষ্টেসন আরও সুন্দর বোধ হইল। পঞ্জাবের কোন কোন ষ্টেসন প্রস্তর নির্ম্মিত।

আমি ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া কাশ্মীর গমনের টঙ্গা বা একা এজেন্সী কোথায় অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় বোম্বাই-প্রদেশের অন্তর্গত "কোলাবা" জেলার বাবু জে, ভি, দেশমুখ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় ভদ্রলোক আমাকে পথিক বা ভ্রমণকারী জানিয়া সমাদরে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। তাঁহার এবম্প্রকার উদারতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি বোম্বাই কিম্বা পঞ্জাবী ভাষানভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথোপকথন করিতে লাগিলাম। তিনি নর্থ-ওয়েষ্টারন্‌-রেলওয়ে, এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অফিসে টাইম-কিপারের পদে নিযুক্ত আছেন। অফিসের বৃহৎ প্রাঙ্গনের

মধ্যে তাঁহার বাসা। বাবু দেশমুখ কোন কার্য্যোপলক্ষে ষ্টেসনে গিয়াছিলেন, তিনি আমাকে বাসায় রাখিয়া পুনরায় আফিসে গেলেন। একে নিদারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে সমস্ত দিন অনশন; শরীর কিছু ক্লান্ত হইয়াছিল, আমি শীঘ্র রন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। বাবু দেশমুখ আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সায়ংকালে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বহির্গত হইলাম।

তিনি আমাকে লইয়া টঙ্গা বা একা এজেন্সীতে গেলেন। রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর (শ্রীনগর) টঙ্গা তিন দিনে এবং একা পাঁচ দিনে পৌঁছে। মেসার্স ধান্‌জিভয় এণ্ড সন্স রাজকীয় ডাকের বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর। মেল টঙ্গা আড়াই দিনে শ্রীনগর পৌঁছে। একটী টঙ্গায় তিন জন আরোহী ও একজন কোচোয়ান বসিতে পারে। টঙ্গার ভাড়া ঠিক থাকে না, কখন বৃদ্ধি কখন হ্রাস হয়। প্রত্যেক আসনের ভাড়া সাধারণতঃ পনর, কুড়ি টাকা হইয়া থাকে। টঙ্গার ন্যায় একাতেও কোচোয়ান ব্যতীত তিন জন বসিতে পারে এবং ভাড়ার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একাতে এক আসনের ভাড়া আট দশ টাকা হয়। টঙ্গা দুই ঘোড়ায় টানে এবং ইহাতে বেরিলি কার্টের ন্যায় পা

ঝুলাইয়া বসিতে পারা যায়। একা এক ঘোড়ায় টানে। একায় বসিলে শরীরে বড় ঝাঁকি লাগে, কিন্তু টঙ্গায় বেশ আরামে যাওয়া যায়। যুক্ত-রাজ্য এবং পঞ্জাবের সর্ব্বত্রই একা ব্যবহৃত হয়, অতএব বঙ্গীয় পাঠকের চক্ষে বোধ হয় ইহা নূতন নহে। এজেন্সীর প্রধান কার্য্যকারকের সহিত একা গাড়ীতে কাশ্মীর যাওয়ার প্রস্তাব করিয়া নয় টাকায় আমার আসনের ভাড়া ঠিক করিলাম। সন্ধ্যার পর রওনা হওয়া স্থির হইল।

আমরা এজেন্সী হইতে বাজারে যাইয়া টুপির দোকান হইতে একটী টুপি খরিদ করিলাম। টুপি গ্রহণ করার কারণ দুইটী—এ প্রদেশে আবরণহীন মস্তকে থাকিলে লোকে বড় ঘৃণা করে, দ্বিতীয়তঃ নগ্নশীর দেখিলে রাজকর্ম্মচারীগণ বাঙ্গালী মনে করিয়া সর্ব্বদা নানা প্রশ্ন করিয়া বড় বিরক্ত করে ও বাঙ্গালী এত দূরদেশে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, ইহারা বিপ্লবকারী দলভুক্ত কিনা ইত্যাদি নানা প্রকার সন্দেহ করিয়া নিরত ছদ্মবেশে পশ্চাদনুসরণ করে। টুপি ব্যবহার করিলে সহসা বাঙ্গালী বলিয়া বুঝা যায় না ও এ সকল উপদ্রবে পড়িতে হয় না, ইহা চিন্তা করিয়া বাবু দেশমুখের উপদেশানুরূপ টুপি খরিদ করিলাম। লক্ষ্ণৌ

ও অমৃতসহরে আমার যে কৈফিয়ত দিতে হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। টুপি থাকিলে সম্ভবতঃ এই বিড়ম্বনা ঘটিত না। বাবু দেশমুখ আমাকে পাগড়ি ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়া তদুপযোগী ৪০ হাত কাপড় খরিদ করিয়া দিতে চাহিলেন। আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না। কারণ অনভ্যস্ত বাঙ্গালীর মস্তকে ৪০ হাত কাপড় বাঁধিলে মস্তক গরম হইবার সম্ভাবনা; অপিচ, উহা খুলিয়া গেলে পুনঃ পুনঃ জড়াইয়া বন্ধন করা অভ্যাসও সময় সাপেক্ষ; এক বিপদ এড়াইবার জন্য নূতন বিপদ আহ্বান করা শ্রেয়স্কর নহে। বিশেষতঃ এ প্রদেশে পাগড়ি ও টুপি উভয়ই যখন প্রচলিত আছে, তখন সুবিধা পাইলে কে অসুবিধা ভোগ করিতে ইচ্ছা করে? আমি দশ আনা মূল্যের একটী কাল রঙের টুপি খরিদ করিলাম। রাওলপিণ্ডিতে টুপি খুব সস্তা; বঙ্গদেশে উহার মূল্য অন্ততঃ দ্বিগুণ হইবে। আমরা ইতস্ততঃ একটু বেড়াইয়া বাসা হইতে পুনরায় এক্কা এজেন্সীতে আসিলাম। আমার সহিত আরও তিন জন পঞ্জাবী ভদ্রলোক সপরিবারে কাশ্মীর রওনা হইলেন। দুইখানি এক্কা লইয়া আমরা সকলে যামিনীযোগে রাওলপিণ্ডি ত্যাগ করিলাম।

উত্তর ভারত ভ্রমণ

বাঙ্গালী জীবনে প্রথম হিমালয়ে চলিলাম—আজ আমার হৃদয়ে কত উৎসাহ, কত আনন্দ! শৈশবে যাহার বিষয় অশীতিপর বৃদ্ধা দিদিমার ক্রোড়ে বসিয়া গল্প শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি, কৈশোরে যাহা মানচিত্রে দেখিয়া কত সুখানুভব করিয়াছি এবং যৌবনে যাহার ভূয়সী প্রশংসা শত শত গ্রন্থে পড়িতেছি, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন ধন্য করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বাঙ্গালীর ত কথাই নাই—যে কখনও পর্ব্বত দেখে নাই, যে আবাল্য তৃণগুল্ম-সমাচ্ছন্ন পল্লীগ্রামে পরিবর্দ্ধিত, ইষ্টকের স্তূপকে পর্ব্বত ভ্রমে যাহার হৃদয় আনন্দে লাফাইয়া উঠে, হিমালয় দর্শনাভিলাষী সেই বাঙ্গালীর প্রাণে কি এক অপূর্ব্ব সুখের উদয় হয়, তাহা বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই ধারণা করিতে পারিবেন। আমার আনন্দে আনন্দিত হইয়া ও আমাকে এই শুভ-কার্য্যে উৎসাহ দিয়া বাবু দেশমুখ সহাস্যে আমাকে বিদায় দিলেন। আমি উৎসাহ সহকারে মহারণ্যে চলিলাম।

দেশ ভ্রমণ ও পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইবার বাসনা আমার বাল্যকাল হইতে বলবতী। "জীবনে যে কোন সময় এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেই হইবে" এই কয়টী অক্ষর আশৈশব আমার হৃদয়ে গাঁথা

ছিল। ইচ্ছা সত্ত্বে, চেষ্টা সত্ত্বে সময় এবং সুবিধা হইয়া উঠে নাই। কেন হইয়া উঠে নাই তাহা বঙ্গীয় পাঠককে নূতন করিয়া না বলিলেও চলে; সকলের যে অবস্থা আমারও তাহাই হইয়াছিল—বঙ্গীয় সন্তান পিতামাতার অঙ্কের নয়ন, নয়নের মণি, সোণার চাঁদ। সে পিতামাতার ক্রোড়ে আজন্ম বর্দ্ধিত, নিরবচ্ছিন্ন স্নেহ ও আদরে প্রতিপালিত এবং সুকোমল শয়ন-ভোজনে চিরাভ্যস্ত; যে ননীর পুতুল দু'দণ্ড চক্ষুর অন্ত-রাল হইলে পিতামাতা অস্থির হন, তাহাকে একাকী বিদেশে পাঠাইয়া তাঁহারা কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, অতএব সন্তানের বিদেশ গমন হইল না।

বঙ্গীয় যুবক প্রিয়তমা পত্নীর রূপে মুগ্ধ, তদীয় ইন্দীবর নেত্রের বিলোল-কটাক্ষে বশীভূত। তাঁহার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বনিতার বস্ত্রাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। যাহার বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর ক্ষণকাল না শুনিলে পতি মূর্চ্ছিতপ্রায় হন, যাহার চরণ কণ্টকবিদ্ধ হইলে স্বামীর শিরঃপীড়া হয়, যে পদ্মহস্ত বুলাইলে শুধু শারীরিক তাপ কেন, ত্রিতাপ দূর হয়, সেই বিরহ-বিধুরা পতি-সোহাগিনী তাঁহার অভাবে কয় দিন বাঁচিবে? অতএব স্বামীর দেশ-ভ্রমণ হইল না। এইরূপ কেহ পিতামাতার

স্নেহে, কেহ প্রণয়িণীর প্রণয়ে, কেহ সন্তানের মমতায়, কেহ প্রতিবাসীর ভালবাসায়, কেহ অর্থের অভাবে, কেহ সঙ্গীর অভাবে ঘরের বাহির হইতে পারে না, পারিলেও কেহ আলস্যবশতঃ অথবা ভ্রমণজনিত বিবিধ ক্লেশ চিন্তা করিয়া ক্ষান্ত হয়, কাহারও হয়ত ভ্রমণের স্পৃহাই হয় না। বাড়ী হইতে বহির্গত না হওয়ার বাঙ্গালীর এইরূপ শত শত কারণ আছে। এবম্বিধ বাঙ্গালী চরিত্র বিদেশীর নিকট উপহাসাস্পদ হইবে ইহা বিচিত্র নহে। আধুনিক সভ্য-জগৎ ভ্রমণকে শিক্ষার এক অঙ্গ মনে করেন। ইয়ুরোপীয়েরা পাঠ্য জীবন শেষ করিয়া একবার মহাদেশ ঘুরিয়া আসে। প্রত্যুক্তঃ ভ্রমণ না করিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। আমাদের দেশে কয়জন লোক ভ্রমণের মূল্য বুঝেন? বলিতে কি, আমি ছয় মাস কাল ভ্রমণ করিয়া যে সামান্য জ্ঞানলাভ করিয়াছি, সমস্ত জীবন ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকে পড়িলেও সেই জ্ঞান হইত না। কারণ সকলেই বুঝেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং শ্রবণ-পঠন বা অনুমান জনিত জ্ঞান—ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কত! ভ্রমণের অশেষ গুণ। ভ্রমণে বহুদর্শীতা লাভ হয়, উৎসাহ বাড়ে, সৎসাহস জন্মে, অন্তঃকরণ প্রশস্ত হয় এবং মন পবিত্র হয়। যিনি

যত বড় হউন না কেন, পর্য্যটনে বহির্গত হইলে ভগবানের অসীম রাজ্যে তাঁহার ক্ষুদ্রত্ব সহজে উপলব্ধি হইবে ও অহঙ্কার অনায়াসে চূর্ণ হইবে। পর্য্যটনে নাস্তিকতা দূর হইয়া, ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে এবং সময় সময় মহাজনের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এজন্য আর্য্য ঋষিরা হিন্দুশাস্ত্রে তীর্থ-পর্য্যটনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অগ্রে আমার সঙ্গী পঞ্জাবী ভদ্রলোকদের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমাদের এক্কায় লালা মূলরাজ ধাওয়ান, তাঁহার পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র সরদারলাল, লালা জগন্নাথ ও আমি। অন্য এক্কায় লালা জ্ঞানচাঁদ কাপুর, তাঁহার স্ত্রী ও এক বৎসর বয়ঃক্রমের একটী পুত্র এবং লালা মূলরাজ ধাওয়ানের স্ত্রী। ইহাঁরা সকলেই ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। লালা মূলরাজ ধাওয়ান পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার-গ্রাজুয়েট। ইনি লালা জগন্নাথের প্রাইভেট শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া কাশ্মীর চলিয়াছেন। লালা জগন্নাথ, কাশ্মীরের ডেপুটী কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল কর্ণেল অনন্তরামের পুত্র। ইনি কাশ্মীর এণ্ট্রেন্স স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। লালা জ্ঞানচাঁদ কাপুর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন।

ইঁনি কাশ্মীরাধিপতির ভ্রাতা ও ভূতপূর্ব্ব চিফ্ মিনিষ্টার স্বর্গীয় অমরসিংহের প্রাইবেট একাউন্ট্ আফিসে চাকুরি লইয়া কাশ্মীর রওনা হইয়াছেন।

কাশ্মীর গমনের পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচটী বিখ্যাত পথ বিদ্যমান থাকিলেও প্রায় সমস্ত লোক এই পথে যাতায়াত করে। লালা জগন্নাথ এই পথে আরও তিন চারিবার কাশ্মীর গিয়াছেন। লালা মূলরাজ এই পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রীনগর গমন করেন নাই। লালা জ্ঞানচাঁদ ও আমি একে-বারে নূতন যাত্রী। লালা মূলরাজের সহিত লালা জ্ঞানচাঁদের আত্মীয়তা আছে। আমি ও লালা জ্ঞানচাঁদ সমবয়স্ক, লালা মূলরাজ আমাদের অপেক্ষা অনেক বড়; লালা জগন্নাথ আমাদের ছোট। ইঁহারা সকলেই বিনয়ালঙ্কৃত। আমি পঞ্জাবী ভাষা না জানায় ইঁহারা কিছু দুঃখিত হইলেন, এবং আমার সহিত সর্ব্বদা ইংরা-জীতে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমার ইংরাজী ভাষা জানা না থাকিলে নানাস্থানে বড় লাঞ্ছনা পাইতে হইত। ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দিভাষার সহা-য়তা ভিন্ন আমি এত দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। আমি উত্তর-ভারতের যতস্থান পরিভ্রমণ

করিয়াছি, প্রায় প্রত্যেক স্থানে "বিদ্যা মিত্রং প্রবাসেষু" এই বচনের যথার্থতা অক্ষরে অক্ষরে অনুভব করিয়াছি। ফলতঃ বিদ্যা "প্রবাসে মাতৃ-সদৃশী"।

রাওলপিণ্ডি পঞ্জাবের সীমান্ত জেলা। এখান হইতে হিমালয় প্রদেশের সীমানা আরম্ভ হইয়াছে। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকার মধ্যে রাওলপিণ্ডি অবস্থিত। পার্ব্বতীয় পথে মাঝে মাঝে চটি বা আড্ডা আছে। একা-ওয়ালা আমাদিগকে সতর্ক করিয়া বলিল যে, রাওল-পিণ্ডি হইতে "ছতর" নামক চটি পর্য্যন্ত দস্যুভয় আছে। এই হেতু রাত্রিকালে এই পথে একখানা একাগাড়ী কখনও চলিতে সাহসী হয় না। রাওলপিণ্ডির গ্রাম অসহনীয়। রাওলপিণ্ডি হইতে ছতর পর্য্যন্ত অত্যন্ত গরম বোধ হয়, কিন্তু একবার হিমালয়-বক্ষে লুকাইলে আর সে আশঙ্কা থাকে না। গরমের পথটুকু রাত্রিতে চলিবার ইচ্ছা করিয়া আমরা রাত্রিকালে পিণ্ডি (রাওলপিণ্ডির নাম সংক্ষেপ করিয়া অনেকে পিণ্ডি বলিয়া থাকেন) ত্যাগ করিয়াছি। সাধারণতঃ সকলেই দিবাভাগে কাশ্মীর রওনা হইয়া থাকে। আজ সপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র একটু মৃদুহাসি হাসিয়া আঁধারে ডুবিয়া গেল। এখন ঘোরান্ধকার, কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না; দুইদিকে অরণ্যানী ভিন্ন আর দেখি-

বারও কিছু নাই। গভীর রজনীতে বন-সঙ্কুল দস্যু সমাকীর্ণ পার্ব্বত্য পথে দুইখানা একা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্নিগ্ধ-গম্ভীর-নির্ঘোষে চলিল। পথশ্রমে আমার নিদ্রার আবির্ভাব হইল। এক্কার ভিতরে শুই-বার স্থান না থাকায় আমি জন্তুর ন্যায় বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে লাগিলাম, তাহাতেও বেশ গাঢ় নিদ্রা হইল। আমার পঞ্জাবী বন্ধুগণ বিপদাশঙ্কায় জাগ্রত ও বিশেষ সতর্ক রহিলেন। ঈশ্বরানুগ্রহে বিপদ কাটিয়া গেল, সুদীর্ঘ রাত্রি প্রভাত হইল।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে চক্ষু মেলিয়া দেখি এখন আর অরণ্যানী নাই, যে দিকে চাই সেই দিকে গণ্ড শৈল ও প্রত্যন্ত পর্ব্বতশ্রেণী। বোধ হইল কোন অজ্ঞাত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া স্বপ্নাভিভূত ব্যক্তির ন্যায় এক নূতন জগতে আসিয়াছি। লালা মুলরাজ বলিলেন "আপনার নিদ্রাবস্থায় রজনীতে "বরাকউ" ও "ছতর" নামক দুইটী চটি ছাড়াইয়া রাওলপিণ্ডি হইতে ১৯ মাইল দূরে "ট্রেট" পৌঁছিয়াছি; ইহা হিমালয়ের পাদদেশ।" সুপ্রভাতে তাঁহার মুখে এই অমৃত নির্ঝরিণী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় আবেগে পূর্ণ হইল ও আনন্দাশ্রু নির্গত হইল। যে

প্রদেশে আসিব বলিয়া কখনও আশা করি নাই, যাহার বিষয় আমাদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকার "এণ্ডেস্" কিম্বা আফ্রিকার "কিলিমাঞ্জেরো" পর্ব্বতের ন্যায় শুধু পুস্তকে পাঠ করিয়াই কুতূহল নিবৃত্তি করেন, জন্মান্তরীণ সুকৃতিবশাৎ আজ সেই পূণ্য প্রদেশ হিমাচলে প্রবেশ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম, জীবন সার্থক হইল, দরবিগলিত নেত্রে দয়াময়কে একবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিলাম। দুঃখ এই,—আমার এ আনন্দে উল্লসিত হইবার দ্বিতীয় বাঙ্গালী নাই। পঞ্জাবীগণ আমার আনন্দে সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদগত-ভাব বাঙ্গালী ভিন্ন পরচিত্তে সম্যক্ পরিস্ফুট হয় কি? অপিচ পঞ্জাবীরা বাল্যাবধি পর্ব্বত দর্শনে অভ্যস্ত, অতএব তাহারা তেমন আনন্দলাভ করিতে পারে না।

বাল্যকাল হইতে আমার সাগর ও হিমালয় দর্শনাকাঙ্ক্ষা বড় বলবতী হয়। পাঠ্য জীবনে প্রথম আশা পূর্ণ হইয়াছিল, এ কথা "সমুদ্র দর্শন" প্রবন্ধে বলিয়াছি; ঈশ্বরানুগ্রহে এবার দ্বিতীয় বাসনাও পূর্ণ হইল। ফলতঃ যিনি কখনও সাগর ও হিমালয় দর্শন করিতে পারেন নাই, তিনি নিশ্চয় জানিবেন, বিধাতার সৃষ্ট দুইটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন দর্শনে তিনি বঞ্চিত রহিয়াছেন।

রাওলপিণ্ডি হইতে ছতর পর্য্যন্ত বন-সঙ্কুল সমতলভূমি দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। ছতর হইতে বন ছাড়াইয়া অসমতল পার্ব্বতীয় পথে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতেছি; এখন আর কোথাও সমতল স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। হিমালয়ের আয়তন সামান্য নহে; বোম্বাই প্রেসিডেন্সী বা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ন্যায় হিমালয় একটী সুবিস্তৃত প্রদেশ। কোটী কোটী শৃঙ্গরাজি পরিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বত পরিশোভিত বহু যোজন বিস্তৃত উন্নত ভূভাগের নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত বা হিমাচল। হিমালয়ের কক্ষে কক্ষে কত মণি মাণিক্য নিহিত আছে ও লোক চক্ষুর অন্তরালে কত তেজঃপুঞ্জ বিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অবস্থান করিতেছেন তাহা কে বলিবে? ম্যাডাম্ ব্লাভ্যাটাস্কী নাম্নী এক রুষ দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়াছেন যে, তির্ব্বত দেশের প্রান্তবর্ত্তী স্থানে এক অভূতপূর্ব্ব মনুষ্য-সমাজের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। থিয়জফিষ্ট-গণ বিশ্বাস করেন যে হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে এক দল সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মনুষ্য বাস করেন। যোগবলে তাঁহারা সর্ব্বশক্তিমান হইয়াছেন। হিমালয়ে কত মাইল ব্যবধানে চটি পাওয়া যাইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই, কখন দুই এক ক্রোশ অন্তর এক পর্ব্বতে দুই তিনটী, অথবা

পাঁচ সাত ক্রোশ অন্তর দুই তিন পর্ব্বত লঙ্ঘন করিলে একটী চটি পাওয়া যায়। সকল চটি সমান নহে। কোন কোন চটিতে আহারাদির বন্দোবস্ত আছে, কোন চটিতে থাকিবার স্থান ভিন্ন আর কিছু নাই, কোন চটিতে তাহাও নাই।

আমরা কখন পর্ব্বত শিখরে উঠিতেছি, কখন পাদ-দেশে নামিতেছি, কখন বা সানুদেশ হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন করিতেছি। যত অগ্রসর হইতেছি, ক্রমশঃ তত ছোট হইতে বড় পর্ব্বত দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু এখানে একটী ছোট পর্ব্বত, ওখানে একটি বড় পর্ব্বত, এ রকম বিশৃঙ্খল পর্ব্বত নাই; সবগুলি বেশ সাজান। ইহা প্রকৃতির চমৎকার খেলা! বোধ হইল, যেন প্রকৃতির বিচিত্র উদ্যানে উদ্যান-রক্ষকের যত্ন ও সুকৌশলে অসংখ্য পর্ব্বতমালা শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। আমার অনুমান হইল, যে পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি তদপেক্ষা সম্মুখের পর্ব্বত-শৃঙ্গ এক হস্ত উচ্চ, এবং তাহার সম্মুখের পর্ব্বত-শৃঙ্গ আরও এক হস্ত উচ্চ। এই প্রকার যেন ঠিক এক হস্ত পরিমাণ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছি। আমি নির্ম্মাণকর্ত্তার এরূপ সূক্ষ্ম পরিমাপ দর্শনে বিস্মিত হইলাম।

আমরা দ্বিপ্রহরে "ঘোড়াগলি" পৌঁছিলাম। এখানে আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, রুটি, দাল ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। একখানা রুটী ওজনে এক পোয়ার কম নহে। জম্বু নগরীতে যে রুটী দেখিয়াছি, ইহার আয়তন তদপেক্ষা অনেক বড়।

ঘোড়াগলিতে একটী হিন্দু ও একটী মুসলমানের দোকান আছে। পঞ্জাবীগণ সেই রাক্ষস-ভক্ষ্য রুটী অতি সমাদরে খাইতে লাগিলেন ও ইহার মধুর আস্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য বারম্বার আমাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের এই তামাসা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

হিমালয়ে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়। পূর্ব্বকথিত একখান বৃহৎ রুটী ও কিঞ্চিৎ দালের মূল্য এক পয়সা। জাল দেওয়া পাকা ওজনের এক সের দুগ্ধের মূল্য ছয় পয়সা। এক ব্যক্তির ভোজনের পরিমাণ দাল বা আলুর তরকারীর মূল্য মাত্র দুই পয়সা। এ অঞ্চলে ছাগ, মহিষ ও গরুর মিশ্রিত দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। এ দেশে সকলেই উষ্ণ দুগ্ধ সেবন করিয়া থাকে, এবং দুগ্ধ সেবনের পর জল পান করে না।

বাঙ্গালীর স্থায় পঞ্জাবী নিষ্ঠাবান হিন্দু নহে, বিশেষতঃ অজ্ঞাত কুলশীল পঞ্জাবী মিঠাইওয়ালার পক আঁটা ও দাল, ব্যঞ্জন ব্রাহ্মণের গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। এই জনশূন্য গভীর বনপ্রদেশে চটিতে বিশ্রামকালে অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক রন্ধন করিয়া আহার করা এক প্রকার অসম্ভব। তাই আমার দুগ্ধই এক-মাত্র সম্বল হইল। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পৌঁছান পর্য্যন্ত প্রাণধারণোপযোগী দুই বেলা কেবল দুগ্ধই পান করিয়াছি। আমার কঠোরতা দেখিয়া পঞ্জাবীগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। আমার এবম্বিধ কষ্ট দেখিয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। আমি তাঁহা-দের সহিত ভোজন-ব্যাপারে একত্রে যোগদান করিয়া ভোজন-সুখ উপলব্ধি করিতে পারি না, এ জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিতেন। মাঝে মাঝে কৌতুকচ্ছলে আমাকে পরিহাসও করিতেন। বস্তুতঃ ইহাতে তাঁহা-দের কোন দোষ নাই, কারণ পঞ্জাবে জাতিগত পার্থক্য খুব কম। অনেক স্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একত্রে আহার করে, অতএব বঙ্গদেশের নিয়ম তাহাদের চক্ষে অপ্রীতিকর হওয়া বিচিত্র নহে। যাহা হউক তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত ও গুণগ্রাহী।

আমাদের দেশের আচার পদ্ধতি আমি তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা অনেকটা বুঝিলেন। আমি দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু আহার করিতে পারি কিনা, শুধু দুগ্ধ পান করিয়া কয়দিন বাঁচিব, ইত্যাদি বাক্য তাঁহারা স্নেহভরে সুমিষ্ট-বচনে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে সর্ব্বদাই আপ্যায়িত করিতেন; প্রতিদানস্বরূপ আমি তাঁহাদিগকে মনে প্রাণে আশীর্ব্বাদ করিতাম, ও মৌখিক শত শত ধন্যবাদ দিতাম।

হিমালয়ে প্রস্রবণের অভাব নাই। আমরা ঝরণার জলে স্নান করিয়া ও ঝরণার জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতাম। হিমালয়ে আসিয়া বোধ হইল যেন এক নূতন দেশে আসিয়াছি। এ স্থানের বায়ু কেমন ঠাণ্ডা। পঞ্জাবের দারুণ গ্রীষ্মে সহিষ্ণুতা সীমার অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু এখানে মৃদু সমীরণের মন্দ মন্দ হিল্লোলে তাপিত প্রাণ শীতল হইল। লালা মূলরাজ বলিলেন, "হিমালয় বৎসরের অধিকাংশ সময় বরফাবৃত থাকে। এখন বরফ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে; হিমালয়ে ইহাই প্রকৃত বসন্তকাল।" এই সুশীতল প্রদেশে আসিয়া আমার ভ্রমণজনিত ক্লেশ ও ক্লান্তি একেবারে বিদূরিত হইল। হিমালয় বস্তুতঃই

হিমময়। অনেক দিন পর ঠাণ্ডা ও মধুর বায়ু-হিল্লোলে আমার বড় নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমি নিকটবর্ত্তী একটী বৃক্ষতলে বড় আরামে শয়ন করিলাম। দিবাভাগে এক্কা কোনস্থানে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করে না। এক্কা সজ্জিত হইলে লালা জ্ঞানচাঁদ আমাকে ডাকিয়া উঠাই-লেন, আমরা রওনা হইলাম। ঘোড়াগলি ছাড়াইলে যে সকল পর্ব্বত দেখিতে লাগিলাম, তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। পর্ব্বত এত বৃহৎ হইতে পারে এ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল না।

চট্টগ্রামের ১২ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে তুঙ্গ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের যে সর্ব্বপ্রধান শৃঙ্গে বাবা চন্দ্রনাথ অবস্থিত আছেন, তাহা সমুদ্র হইতে প্রায় ১১০০ ফুট উচ্চ। তথাপি তাহা এ সকল পর্ব্বতের কটিদেশের সমান হইবে না। পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহ এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় বৃহৎ হইতে বৃহত্তর-অনুমান করা যায় না। এখন বোধ হইতেছে সমস্ত শৃঙ্গই সমান, অতি বৃহৎ ও গগনভেদী—সম-স্তেরই চূড়া নভোমণ্ডল স্পর্শ করিয়াছে। বোধ হইল যেন ইহারা সংহার-মূর্ত্তি ধারণ করতঃ চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া আমাদিগকে একেবারে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে। এই নব দৃশ্যে শিহরিয়া উঠিলাম! ক্ষুদ্র

বাঙ্গালীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আকাশজোড়া ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী এক একটী ভীষণ পর্ব্বত দেখিলে চক্ষু স্থির হয়! এ দৃশ্য যেমন ভয়ঙ্কর তেমন মনোহর।

চারিদিকে চাহিয়া দেখি, বিরাট কাণ্ড; প্রকৃতির এক মহা প্রদর্শনী! যে দিকে নিরীক্ষণ করি সেই দিকেই শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ, তারপর শৃঙ্গ, আবার শৃঙ্গ, এ ভাবে অনন্ত শৃঙ্গমালা চলিয়া গিয়াছে, ইহার সীমা নাই, অবধি নাই। চিরকাল হাঁটিলেও বোধ হয় ইহার শেষ হইবে না। এক একটী পর্ব্বত কেমন গম্ভীর ও মহিমাব্যঞ্জক! যেন মহাযোগী যুগ যুগান্তর ধরিয়া মহা-ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন। এ দৃশ্য পরম রমণীয়! আমি সেই অনন্ত কৌশলময় বিশ্ব-নিয়ন্তার অপরূপ বৈচিত্র-দর্শনে ভক্তিভরে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। পাঠক, আমার শত অনুরোধ, সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া একবার ছুটিয়া আসিয়া এ মাধুরী স্বচক্ষে অবলোকন করুন, ও শ্রীভগবানের প্রকৃত মহত্ত্ব অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করুন। পঞ্জাবীরা আমার আনন্দ কি বুঝিবেন? বল্মীক স্তূপ দেখিয়া যে বাঙ্গালী পাহাড় মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, তাহার সম্মুখে অনন্ত প্রসারিত হিমা-লয়ের লক্ষ লক্ষ শৃঙ্গ! আমি এ দৃশ্য দেখিয়া যে

আনন্দ পাইয়াছি, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ এ জীবনে পাই নাই, এবং আর কখনও পাইবার সম্ভাবনা আছে কিনা জানি না। প্রত্যুতঃ মর্ত্ত্যভূমে যদি কেহ স্বর্গ প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ করেন তবে মা ভগবতীর পিত্রালয় হিমাচলে আসুন। ইহাই স্বর্গ, ইহাই আনন্দ-ধাম। এ স্থানে রোগ শোক নাই, রাজকীয় শাসন নাই, দম্পতীর কলহ নাই, সংসারের জ্বালা নাই, কিছুই নাই; আছে কেবল অবিরাম সুখ, অবিরাম আনন্দ, অবিরাম শান্তি। আর আছে অতীতের চির-সাক্ষী দিগন্ত বিস্তৃত হিমাচল। যে দিকে চাও, দেখিবে সহস্র সহস্র শৃঙ্গ উন্নত শীরে সহস্র দিক হইতে তোমাকে আশী-র্ব্বাদ করিতেছে; মঙ্গলময়ের কি অসীম করুণা।

আমরা বিখ্যাত "মরি" পর্ব্বতের দুই মাইল দূরে পৌঁছিলাম। মরি পর্ব্বতে ইংরাজের বৃহৎ সেনানিবাস আছে। মরির স্বাস্থ্য চমৎকার। শত শত ইংরাজ এই পর্ব্বতে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনে আসিয়া থাকেন। এই পর্ব্বতে সর্ব্বদা বৃষ্টি হইতেছে, তথাপি কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় না। এ স্থান ইংরাজের ঘন বসতিতে পরিপূর্ণ। রাওলপিণ্ডি হইতে ইহা ৩৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেক হোটেল ও দোকান আছে। রাওলপিণ্ডি হইতে

টঙ্গা গাড়ীতে এখানে ছয় ঘণ্টায় ডাক আসে। এ স্থান হইতে মরি পর্ব্বতের দৃশ্য মনোহর। দালান, কোটা, ঘর, বাড়ী সমস্তই যেন একটী উচ্চ পর্ব্বতের চূড়ায় ঝুলিতেছে। যাঁহারা কষ্ট সহকারে হিমালয়ের সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক শ্রীনগর গমন করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কেবল মরি পর্ব্বত দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা রাওলপিণ্ডি হইতে মরি পর্য্যন্ত রিটারণ্ টঙ্গা কিম্বা একা করিবেন। রিটারণ করিলে পনর দিন সময় পাওয়া যাইবে এবং ভাড়া অপেক্ষাকৃত সুলভ হইবে। রাওলপিণ্ডি হইতে মরি পর্য্যন্ত রিটারণ্ টঙ্গা এক আসনের ভাড়া বার টাকা ও সম্পূর্ণ টঙ্গার ভাড়া প্রায় চল্লিশ টাকা লাগিবে। যাওয়ার সময় এক আসনের ভাড়া ৮৲ আট টাকা লাগে।

আমরা অপরাহ্নে "সনিব্যাঙ্ক্" পৌঁছিলাম। মরি পর্ব্বতে স্থানাভাব হওয়ায় এখানেও সৈন্যেরা ছাউনী করিয়াছে। মরি পর্ব্বত হইতে সনিব্যাঙ্ক্ বেশী ব্যবধান নহে। সনিব্যাঙ্কে সৈন্যেরা দলে দলে বহির্গত হইয়া মনের আনন্দে বৈকালীক সমীরণ সেবন করিতেছে। কেহ বন্য হরিণের ন্যায় লাফাইতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ শীষ দিতেছে, কেহ পক্ষী শীকারা-

ম্বেষণে বন্দুক লইয়া দৌড়াইতেছে ; সকলেই প্রফু-ল্লিত, সকলেই হর্ষোৎফুল্ল লোচন। স্থানভেদে, অবস্থা ভেদে অতি সহজে মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এ জন্যই আমাদের দেশের লোকে বলে—"গৃহপালিত বিড়াল বনে গেলে বন-বিড়াল বা খাটাস্ হয়"। যাহা হউক উৎকৃষ্ট জলবায়ুর গুণে নীরস সৈনিক জীবনও সরস হই-য়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্তে বাস করিয়া আজ ইহারা কত সুখী!

আমরা সনিব্যাঙ্ক্ হইতে "টোপা" উপনীত হইলাম। টোপা দুইভাগে বিভক্ত, আপার টোপা ও লোয়ার টোপা। টোপায় নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, কেবল পর্ব্বত; সমতলভূমির চিহ্নও নাই। মৃত্তিকা বা সমতলভূমি যে কত নিম্নে রহিয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা গেল না। আমরা মরি পর্ব্বতের নিকট আসিয়াই অল্প অল্প বৃষ্টি পাইয়াছিলাম, এখানে বেশ বৃষ্টি হইতে লাগিল। এক্কার ছাদে আবরণ থাকিলেও সে আবরণ ভেদ করিয়া টপ্ টপ্ করিয়া আমাদের গায়ে বৃহৎ ফোঁটা পড়িতে লাগিল ও ঝাপ্টা বাতাসে বস্ত্রাদির কিয়দংশ ভিজিয়া গেল। রাস্তায় কোথাও গাড়ী রাখি-বার সুবিধা নাই; আমরা ভিজিতে ভিজিতে সায়ংকালে "বগলা" উপস্থিত হইলাম।

[১২.১

বগলায় বড় ঝড় আরম্ভ হইল। হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে তুমুল তুফাণ। উভয়ে মহাযুদ্ধ। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত গভীর গর্জ্জনে সবেগে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পর্ব্বতকে এক একবার ধাক্কা মারিতেছে—বোধ হইতেছে পর্ব্বতটী একেবারে উড়িয়া গেল; কিন্তু চির-সহিষ্ণু হিমাচল অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই আঘাত সগর্ব্বে উপেক্ষা করিতেছে—তাহার একটী প্রস্তরকণাও কম্পিত হইতেছে না। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ক্লান্ত হওয়ায় আক্রমণের বেগ কমিয়া আসিল। ঝড় পরাস্ত হইল। আমরা অধোদৃষ্টি-নিক্ষেপে দেখিলাম পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণস্থানে আসিয়া বেচারা পলায়ন করিবার পথ পাইতেছে না—ছুটাছুটি করিয়া একবার এ পর্ব্বতে একবার ও পর্ব্বতে যাইতেছে। মহামহিমান্বিত অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হিমগিরির নিকট প্রবল বাত্যার দর্প চূর্ণ হইল। যাহার প্রতাপে জগৎ ত্রাসিত সেই প্রভঞ্জন হিমাচলের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইল! যিনি যত বড় হউন, দর্পহারী ভগবান বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবমাত্রেরই এইরূপ দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিলাম। এ দৃশ্য বড় ভীষণ অথচ নয়নানন্দদায়ক। আমরা এত উর্দ্ধে উঠিয়াছি যে অধিকাংশ ঝড় নিম্নপর্ব্বতে বহিতে লাগিল।

বগলায় চটি ভাল নহে। এখানে একটী দোকান ও একটী শয়ন-গৃহ আছে, ইহা ছাড়া আর কিছু নাই। এখানে দুগ্ধ পাওয়া যায় না। হিমালয়-পথে রাত্রিকালে টঙ্গা কিম্বা একা চালাইবার নিয়ম নাই। যে চটিতে সন্ধ্যা হইবে সেই চটিতে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। এই নিয়মানুসারে আমরা বগলায় থাকিতে বাধ্য হইলাম।

হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রথম হইতেই বেশ শৈত্য অনুভব করিতেছিলাম, এখন ঝড় ও বৃষ্টি হওয়াতে অতিশয় শীত বোধ হইল। আমি হিমালয়ের শীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, পরন্তু দারুণ গ্রীষ্মকালে আর কত শীত লাগিবে, ইহা চিন্তা করিয়া গৃহ হইতে একখানা দেশী আলোয়ান লইয়া বহির্গত হইয়াছিলাম। ইহাতে শীত মানিবে কেন? আমি শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম ও ভাবিলাম—জ্যৈষ্ঠ মাসেই এই অবস্থা, এখানে পৌষ মাসে আসিলে না জানি কি উপায় হইত।

পঞ্জাবীরা সকলেই আহার করিলেন। আমার তত ক্ষুধা ছিল না, বিশেষতঃ আমি শীতে কুঞ্চিত হইয়া রহিলাম। নড়িতে ইচ্ছা হইল না। চেষ্টা করিলেও আমার আহার্য্য এখানে কিছু পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ। শয়নঘরের এক পার্শ্বে পঞ্জাবীরা ও অন্য পার্শ্বে

বগলায় বড় ঝড় আরম্ভ হইল। হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গে তুমুল তুফাণ। উভয়ে মহাযুদ্ধ। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত গভীর গর্জ্জনে সবেগে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পর্ব্বতকে এক একবার ধাক্কা মারিতেছে—বোধ হইতেছে পর্ব্বতটী একেবারে উড়িয়া গেল ; কিন্তু চির-সহিষ্ণু হিমাচল অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া এই আঘাত সগর্ব্বে উপেক্ষা করিতেছে—তাহার একটী প্রস্তরকণাও কম্পিত হইতেছে না। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ক্লান্ত হওয়ায় আক্রমণের বেগ কমিয়া আসিল। ঝড় পরাস্ত হইল। আমরা অধোদৃষ্টি-নিক্ষেপে দেখিলাম পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণস্থানে আসিয়া বেচারা পলায়ন করিবার পথ পাইতেছে না—ছুটাছুটি করিয়া একবার এ পর্ব্বতে একবার ও পর্ব্বতে যাইতেছে। মহা-মহিমান্বিত অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হিমগিরির নিকট প্রবল বাত্যার দর্প চূর্ণ হইল। যাহার প্রতাপে জগৎ ত্রাসিত সেই প্রভঞ্জন হিমাচলের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইল! যিনি যত বড় হউন, দর্পহারী ভগবান বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবমাত্রেরই এইরূপ দর্প চূর্ণ করিয়া থাকেন। আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখিলাম। এ দৃশ্য বড় ভীষণ অথচ নয়নানন্দদায়ক। আমরা এত উর্দ্ধে উঠিয়াছি যে অধিকাংশ ঝড় নিম্নপর্ব্বতে বহিতে লাগিল।

বগলায় চটি ভাল নহে। এখানে একটী দোকান ও একটী শয়ন-গৃহ আছে, ইহা ছাড়া আর কিছু নাই। এখানে দুগ্ধ পাওয়া যায় না। হিমালয়-পথে রাত্রিকালে টঙ্গা কিম্বা একা চালাইবার নিয়ম নাই। যে চটিতে সন্ধ্যা হইবে সেই চটিতে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। এই নিয়মানুসারে আমরা বগলায় থাকিতে বাধ্য হইলাম।

হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রথম হইতেই বেশ শৈত্য অনুভব করিতেছিলাম, এখন ঝড় ও বৃষ্টি হওয়াতে অতিশয় শীত বোধ হইল। আমি হিমালয়ের শীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, পরন্তু দারুণ গ্রীষ্মকালে আর কত শীত লাগিবে, ইহা চিন্তা করিয়া গৃহ হইতে একখানা দেশী আলোয়ান লইয়া বহির্গত হইয়াছিলাম। ইহাতে শীত মানিবে কেন? আমি শীতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম ও ভাবিলাম—জ্যৈষ্ঠ মাসেই এই অবস্থা, এখানে পৌষ মাসে আসিলে না জানি কি উপায় হইত।

পঞ্জাবীরা সকলেই আহার করিলেন। আমার তত ক্ষুধা ছিল না, বিশেষতঃ আমি শীতে কুঞ্চিত হইয়া রহিলাম। নড়িতে ইচ্ছা হইল না। চেষ্টা করিলেও আমার আহার্য্য এখানে কিছু পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ। শয়নঘরের এক পার্শ্বে পঞ্জাবীরা ও অন্য পার্শ্বে

পঞ্জাবী মহিলারা বিছানা করিলেন। দূরদেশে সর্ব্বত্র বিছানার বোঝা সঙ্গে বহন করা গলগ্রহ বিবেচনায় আমি বিছানা লইয়া আসি নাই। লালা মূলরাজ আমাকে সযত্নে তাঁহাদের বিছানায় শয়ন করাইলেন। তাঁহাদের সহিত হিমালয় ও কাশ্মীর অঞ্চলের শীত নিবারণোপযোগী পট্টু, কম্বল ইত্যাদি অনেক বস্ত্র ছিল। ফরাসের সতরঞ্চির ন্যায় একটী বৃহৎ পুরু কম্বল পাতিয়া বিছানা করা হইল। আমি এ রকম বৃহৎ কম্বল আর দেখি নাই। আমরা প্রত্যেকে এক একটী কম্বল গাত্রে দিয়া বেশ আরামে শয়ন করিলাম।

এই নির্জ্জন হিমালয়-সমুদ্রে এক্কাওয়ালাগণ আরোহীর কর্ণধার। তাহাদের ক্ষমতা প্রচুর। তাহারা আরোহীকে যখন যে আদেশ করিবে, অবিলম্বে বিনা বাক্য ব্যয়ে তখনই তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। রাস্তা একটু উচ্চ হইলে অথবা না হইলেও খাম্‌খেয়ালী ভাবে তাহারা আরোহীদিগকে যে স্থানে নামিতে বলিবে সেই স্থানেই নামিতে হইবে এবং যাবৎকাল পুনরায় উঠিতে আদেশ না করিবে তাবৎকাল পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাঁটিয়া এবং কোন সময় দৌড়িয়া যাইতে হইবে, ইহার দ্বিরুক্তি করিলে তাহারা বর্ব্বরোচিত ভাষায়

গালাগালি করিতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না। বলিতে গেলে তাহারাই এই পথের শাসনকর্ত্তা। তাহারা মনে ভাবে যে, আরোহীগণ যতক্ষণ এই গভীর পর্ব্বতসমূহ উল্লঙ্ঘন না করিবে ততক্ষণ তাহারা উহাদের ক্রীড়া-পুত্তলি। আমি তাহাদের এইরূপ অভদ্রোচিত ব্যবহার দর্শনে যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম। কর্ত্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন কেন জিজ্ঞাসা করায় লালা মূলরাজ বলিলেন, "এই ক্লেশকর দুর্গম পার্ব্বত্য-পথে কেবল হীন-বংশোদ্ভব অসভ্য পঞ্জাবীরাই কোচোয়ানের কার্য্য করিয়া থাকে। এই বর্ব্বরদিগকে তীব্র শাসন করিলেও ইহাদের চরিত্র সংশোধিত হয় না। অসভ্য কি সহজে সভ্য হয়?" আমরা ১৪ই জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঝরণার জলে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক একায় রওনা হইলাম। মহামোহ-কারিণী বিষ্ণুমায়ায় আমরা এমনই আচ্ছন্ন যে, পরম পবিত্র সিদ্ধজনাধ্যুষিত ব্রহ্মাবর্ত্তের অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশিও আমাকে গৃহের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য হইতে একেবারে ভুলাইতে পারিল না। দূর বঙ্গের কোণে সেই ক্ষুদ্র পল্লী, সেই ভদ্রাসন, সেই আত্মীয়-স্বজন একে একে সমস্তই মনে পড়িল। তাই বুঝি কবি গাহিয়াছেন :—

" 'Mid pleasures and places
though we may roam
Be it ever so humble, there's
no place like home ;
A charm from the sky
seems to hallow us there,
Which, wherever we rove,
is not met with elsewhere,
Home ! home ! sweet, sweet home !
There's no place like home,
there's no place like home."

হিমালয় চতুর্দ্দিক পর্ব্বত-প্রাচীরে বেষ্টিত হওয়ায় আমরা প্রায় এক দণ্ড বেলা না হইলে অংশুমালীর প্রফুল্ল মুখ দর্শন করিতে পারিতেছি না ; এ দিকে প্রায় এক দণ্ড বেলা থাকিতে সূর্য্যদেব পর্ব্বত-গহ্বরে আশ্রয় লইতেছেন। অনেক উচ্চ বিধায় নিম্নের বায়ু অপেক্ষা এ স্থানের বায়ু অপেক্ষাকৃত একটু পাতলা, সেই হেতু এখানে সূর্য্যের তেজ অতি প্রখর। আমরা মুক্তদেহে দশ মিনিট সূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া এই তেজ সহ্য করিতে সক্ষম হইতেছি না। অনাবৃত দেহে দাঁড়াইলে অনুমান হয় যেন রশ্মিসমূহ প্রতি রোমকূপে প্রবিষ্ট হইয়া সূচ্যাগ্রের

ন্যায় আঘাত করিতেছে, ও সূচিভেদ্য যাতনায় শরীর কণ্টকিত হইতেছে।

আমরা বেলা নয় ঘটিকার সময় "ফাগুয়ারী" উপনীত হইলাম। প্রতি চটিতেই ঘোড়া বিশ্রাম করিয়া থাকে; এখানেও একটু বিশ্রাম করিয়া রওনা হইল। এ প্রদেশের ঘোড়া কি শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু! ইহারা অসমতল পার্ব্বতীয় পথ ভ্রমণে চিরাভ্যস্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, মাত্র একটী ঘোটক হিমালয়ের শত শত শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া শ্রীনগর উপনীত হয়। বঙ্গদেশের ঘোটক হইলে দুই তিন ক্রোশ অন্তর পরিবর্ত্তন করিতে হইত।

এই পথে নির্ঝরের অস্ফুট তান বড় শ্রুতি-মধুর। নির্ঝরের অভাব নাই। চতুর্দ্দিক হইতে সমস্বরে ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হইয়াছে; বোধ হইতেছে যেন গন্ধর্ব্বগণ অদৃশ্যে থাকিয়া সঙ্গীতামোদে মত্ত রহিয়াছেন। পর্ব্বতগুলি এত বড় যে পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে শৃঙ্গে বা পাদদেশে একটী ঘোটকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে হঠাৎ কিছুই দেখা যায় না; অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে বোধ হয় একটী রক্তবর্ণ পিপীলিকা হাঁটিতেছে।

শ্রীনগর পথে ডাকের বন্দোবস্ত খুব ভাল। মেল

টঙ্গার ঘোড়া ছয় মাইল অন্তর বদল হয়। ছয় মাইল পর একটী ঘোড়ার ঘর আছে, তথায় পূর্ব্ব হইতেই ঘোড়া সজ্জিত থাকে; টঙ্গা আসিলে আর বিলম্ব করিবার সাধ্য নাই, ঘোড়া বদলাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়। টঙ্গার ঘোড়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চলে। মেল টঙ্গার বিগল থাকে। সম্মুখে কোন গাড়ী দেখিলে টঙ্গাওয়ালা বিগল বাজায়। বিগলের শব্দ শুনিলেই কোচোয়ান পথ ছাড়িয়া গাড়ী লইয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়। টঙ্গা কোন চটিতে অপেক্ষা করে না। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর আড়াই দিনে ডাক পৌঁছে। আমরা কথনও ঊর্দ্ধে উঠিতেছি, কথনও নিম্নে নামিতেছি, এইরূপ অনেক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দ্বিপ্রহরে "বাঁসিয়ায়" পৌঁছিলাম।

বাঁসিয়ায় আসিয়া ঝিলেম নদী দেখিলাম। শৈলবিহারিণী ক্ষীণ-কলেবরা স্রোতস্বিনী কাশ্মীরের ওয়েলার হ্রদ হইতে বহির্গত হইয়া যৌবনের প্রথম তরঙ্গে উদ্ভাসিত হইয়া হিমগিরির পাদদেশ চুম্বন করিতে করিতে আপন মনে মুক্তপথে ছুটিতেছে। দৃশ্য বড় চমৎকার! আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিলাম। হিমালয়ে প্রথম গিরি-নদী দেখিয়া আমার অবগাহন করিতে

অত্যন্ত স্পৃহা হইল, কিন্তু নদী অনেক নিম্নে রজত রেখাবৎ প্রবাহিত হইতেছে; তথায় নামিয়া অবগাহনান্তর পুনরায় এখানে উপস্থিত হইতে অন্ততঃ দ্বিপ্রহরের দরকার, ইহা চিন্তা করিয়া সে আশা মনেই সংগুপ্ত রাখিলাম। স্বেচ্ছা-বিহারিণী তটিনী উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে গাহিতে বঙ্কিমগতিতে অন্য পথ দিয়া পঞ্জাবে চলিয়া গিয়াছে; সেই হেতু আমরা গত দুই দিবস হিমালয়-পথে ঝিলেম নদীর দর্শন পাই নাই।

পার্ব্বত্য-জাতির বাস-গৃহ বড় সুন্দর। প্রত্যেক গৃহে দালানের ন্যায় কাঠের কড়িকাঠ ও বরগা আছে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে ও উপরে শুধু মাটির আস্তরণ। হিমালয়ের মৃত্তিকা এত শক্ত যে চূণ সুরকি ব্যতীত শুধু মৃত্তিকার ছাদ বা বেড়া বেশ মজবুত হয়।

একাওয়ালার প্রতাপ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে বাঁসিয়ায় আসিয়া আমাদের নিকট ভাড়ার অর্দ্ধেক চাহিল। নিয়ম এই—শ্রীনগর পৌঁছিলে চৌধুরীকে (আরগাড়ার প্রধানকে চৌধুরী বলে) সম্পূর্ণ টাকা দিয়া রসিদ লইতে হইবে। কিন্তু একাওয়ালার আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য নাই। পঞ্জাবী বন্ধুগণ বিনা বাক্য ব্যয়ে বিনা রসিদে তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধেক টাকা দিলেন।

আমি দুই চারিবার নিষ্ফল প্রতিবাদ করিলাম—আমার কথা জলে ভাসিয়া গেল। কি করি, আমি একাকী, নিরবলম্ব, আর দ্বিতীয় বাঙ্গালী নাই। পঞ্জাবী যাঁহারা আছেন, তাঁহারা নিতান্ত ভীরু। পঞ্জাবী বলিতে আমাদের মনে শৌর্য্য বীর্য্যের যে উচ্চভাব আসিত, এখন আর সে দিন নাই। পঞ্জাবীর সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের চরিত্র সম্যক্ অবগত হইয়াছি এবং তাহাদের অনিবার্য্য পতনে দুঃখিত হইয়াছি; তথাপি অন্যান্য অনেক গুণে তাহারা এখনও শ্রেষ্ঠ জাতি। যাহা হউক, নয় টাকার মধ্যে আমি চারি টাকা দিতে বাধ্য হইলাম ও মনে মনে সুমিষ্ট সম্বোধনে সেই বর্ব্বর কোচোয়ানকে অশেষ আশীর্ব্বাদ করিলাম।

প্রাতঃকাল হইতে আমি কর্ণের বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলাম, বাঁসিয়ায় আসিলে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। সহসা এ প্রকার বেদনা হইবার কারণ কি? গত রাত্রিতে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল, রাত্রিকালে শয়ন না করা পর্য্যন্ত অধিকক্ষণ ঠাণ্ডা লাগিয়াছে, অতএব অনুমান করিলাম, শৈত্য-বায়ু সংস্পর্শে কর্ণকুহরে প্রদাহ হইয়াছে। এই জনহীন গভীর নির্জ্জন পর্ব্বতে ঔষধ কোথায় পাইব? আমি বেদনায়

অস্থির হইলাম। আমার কুঞ্চিত আনন দর্শন করিয়া পঞ্জাবী বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইলেন। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া আশু প্রতিকারের আকাঙ্ক্ষায় লালা জগন্নাথকে একটু তৈল উষ্ণ করিয়া আনিতে বলিলাম। পঞ্জাবে ও হিমালয়ে সর্ব্বত্রই তিল তৈল ব্যবহৃত হয়। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে তিল তৈল উষ্ণ করিয়া আনিলে লালা মূলরাজ আমার কর্ণে ঈষদুষ্ণ তৈল ঢালিয়া দিলেন। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের মহতী অনুকম্পায় পাঁচ মিনিটের ভিতর বেদনা একেবারে সারিয়া গেল, সামান্য ঔষধ মন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিল; আমি আরোগ্যলাভ করিলাম। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে আহারান্তে আমরা সকলে বাঁসিয়া হইতে রওনা হইলাম।

বাঁসিয়া হইতে দূর-পর্ব্বতে বরফ দেখা গেল। এই পর্ব্বত বোধ হয় প্রায় পঞ্চাশ মাইল ব্যবধানে স্থিত। এই দৃশ্য যদিও অস্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু দৃশ্য মনোরম। পর্ব্বত শৃঙ্গ রৌপ্য-নির্ম্মিত। ইহাও এক নূতন দৃশ্য। হিমালয়ের চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই নূতন, সকলই অদ্ভুত, সকলই বৈচিত্র্যময়। প্রকৃতি এখানে অনন্ত বর্ণে অনন্ত ভাবে

খেলা করিয়া পর্য্যটকের হৃদয়ে অনন্ত ভাবের উদ্দীপনা করিয়া থাকে। প্রিয় পাঠক, যে হিমাচলের অনন্ত শৃঙ্গ তরঙ্গ খেলিতে খেলিতে হিন্দুকুশে মিশিয়াছে, অনন্ত বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত সেই হিমাচলের এমন তরঙ্গায়িত বিমল শোভা সন্দর্শন করিয়া যদি সৌন্দর্য্য-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে ইচ্ছা করেন তবে শত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া আসিয়া একবার মুক্ত প্রকৃতির অনন্ত স্রোতে গা ঢালিয়া দিন, দেখিবেন এমন পবিত্র শান্তির স্থান, একাধারে প্রেম, জ্ঞান ও ভক্তির এমন সৌন্দর্য্য-সমাবেশ হিমালয় ভিন্ন আর কোথাও নাই।

ঝিলেম নদীর বঙ্কিম ব্যবচ্ছেদে রাজপথ সম্প্রসারিত। গিরি পার্শ্ববাহী সেই পথের একদিক তুঙ্গ পর্ব্বত প্রাচীরে বেষ্টিত এবং ইহার বিপরীত দিক বা নদীর দিক প্রস্তরস্তম্ভে সুরক্ষিত। এই ভাবে বরাবর বারামুল্লা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বলা বাহুল্য, নদী অনেক নিম্নে বহিতেছে। সহসা কোন গাড়ী পর্ব্বত গহ্বরে বা নদীতে পড়িয়া চূর্ণ হইয়া না যায় সেই উদ্দেশ্যে পথের পার্শ্ব দিয়া প্রস্তরস্তম্ভ সযত্নে সুরক্ষিত হইয়াছে। পথের ধারে চারি পাঁচ মিনিট পরই এক একটী ঝরণা আছে। রাস্তায়

ধারে ঘোড়ার জল খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে চৌবাচ্চা বান্ধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন জায়গায় পাইপ বসাইয়া উচ্চস্থান হইতে ঝরণার জল আনা হইয়াছে। পথ ক্রমে উচ্চে উঠিয়াছে অথবা ক্রমে নিম্নে নামিয়াছে; অতএব গাড়ীর হঠাৎ পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাস্তার গঠন বড় সুন্দর। আমরা ধীরে ধীরে এত ঊর্দ্ধে উঠিতেছি যে রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিলে কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু দশ পনর মিনিট অন্তর এক পার্শ্বে দৃষ্টি করিলে বুঝা যায় যে প্রায় পঁচিশ হাত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছি; ইহা চতুর ইঞ্জিনিয়ারের বাহাদুরী বটে। অধিকাংশ স্থানে পর্ব্বত কাটিয়া রাস্তা বাহির করিতে হইয়াছে। পর্ব্বতের গা দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণপ্রণালী প্রশংসনীয়। এই কার্য্য বহুদিনে বহু বৎসরে সুকৌশলে সম্পন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

হিমাচলের নিকট সকলেই পরাজিত। যে ঝিলেম নদী পঞ্জাবে বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, যাহার খরতর বেগ পর্য্যটকের চক্ষে নিয়ত ভীতি উৎপাদন করে, যাহার ভীষণ জলপ্রবাহ সাগরাংশের ন্যায় দেখায়, সেই ঝিলেম নদী উৎপত্তি-স্থান হইতে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া হিমালয়ে

[১৩৩

আসিয়া রাস্তা না পাইয়া নিতান্ত অপ্রশস্ত পথে যেন সঙ্কুচিত দেহে প্রাণ ভয়ে দৌড়িয়া চলিয়াছে, এবং প্রতি-হিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া ক্রুদ্ধা ফনিণীর ন্যায় গর্জ্জন করি-তেছে। আমি বঙ্গসাগর পারে দাঁড়াইয়া যে প্রকার ভীম গর্জ্জন শুনিয়াছি ইহা তদপেক্ষা ন্যূন বলিয়া বিবেচিত হইল না। সর্ব্বদা ভীষণ গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে বোধ হইল যেন আমাদের কর্ণ পটহ ছিঁড়িয়া গিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া আমরা নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া চলিলাম, এবং ক্রমে নীচে নামিতে নামিতে অবশেষে কোহাল্লায় উপস্থিত হইলাম। রাওলপিণ্ডি হইতে কোহাল্লা ৬৪ মাইল। এখানে ঝিলেম নদীর তীরে সুন্দর ডাক-বাংলা আছে। নদীর পরপার হইতে কাশ্মীর রাজ্যের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। এপারে ব্রীটিশ গবর্ণ-মেণ্টের কর্ম্মচারী এবং ওপারে কাশ্মীরাধিপতির কর্ম্মচারী আছে। আমাদের প্রত্যেক গাড়ীর ট্যাক্স দিতে হইল। ট্যাক্স আমাদের পৃথক দিতে হইল না, ভাড়ার টাকা হইতে একাওয়ালাই দিয়াছিল। প্রত্যেক টঙ্গার ট্যাক্স এক টাকা, কিন্তু একার ট্যাক্স কত তাহা স্মরণ নাই। নদীর উপর সুন্দর পোল নির্ম্মিত হইয়াছে। পোল পার হইয়া আমরা কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। এখানে কাষ্টম

হাউস্ আছে। মহারাজার কর্ম্মচারী বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিল। পরীক্ষা উভয় পারেই হইল। ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ঘোড়া পরীক্ষা করিল। আমরা কোহাল্লা হইতে পুনরায় ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। কাশ্মীর-পথে অনেক গরুর গাড়ী ও উটের গাড়ী চলে। গরুর গাড়ীতে মালপত্র যায়। উটের গাড়ীতে, এক্কা অথবা টঙ্গার ন্যায আরোহীগণ বসিতে পারে। একটী উটের গাড়ীতে ন্যূন পক্ষে দশ বার জন লোক বসিয়া থাকে। উটের গাড়ী দোতালা। গরুর গাড়ী অপেক্ষা এই গাড়ী কিছু দ্রুত চলে। কোহাল্লা ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্টের সীমা পর্য্যন্ত ইংলিশ মাইল রহিয়াছে, এবং মহারাজার সীমা হইতে রক্তবর্ণ প্রস্তর-ফলকে কাশ্মীরী মাইল লিখিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে পর্ব্বত-গহ্বরে, নদী-তীরে পার্ব্বত্য জাতি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। পর্ব্বতের শৃঙ্গ হিমময় বলিয়া তাহারা কথনও শৃঙ্গে বাস করে না। আমরা পর্ব্বতের সানুদেশে দুই একটী কুটীর দেখিয়াছি, কিন্তু অতি বিরল; অধিকাংশ কুটীর পাদমূলে অবস্থিত। আমরা চটিতে যেরূপ কাষ্ঠের গৃহ দেখিয়া আসিতেছি, পার্ব্বতীয় জাতির গৃহ তদ্রুপ কাষ্ঠ নির্ম্মিত। ইহারা কুটীরের সন্নিকটে পর্ব্বতের নিম্নদেশে স্থানে স্থানে

অতি কষ্টে মৃত্তিকা খনন করিয়া ধান্তের আবাদ করে এবং ঝরণা বা নদী হইতে জল আনিয়া ক্ষেত্র সিঞ্চন করে। অনেক সময় পর্ব্বত-শিখরের ঝরণার জল যাহাতে ক্ষেত্রে পতিত হয় সেইরূপ নালা কাটিয়া সংযোগ করে এবং ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্রান্তরে জল যাওয়ার সুবিধা করিয়া দেয়। পর্ব্বতে ফসল উৎপন্ন করা সহজ-সাধ্য নহে। পার্ব্বত্য দেশে এতাদৃশ কঠোর পরিশ্রম শুধু পার্ব্বত্য জাতির পক্ষেই সম্ভবে। ইহারা দীর্ঘকায় ও গৌরবর্ণ, ইহাদের দেহ কর্ম্মঠ, কিন্তু নেপালী বা ভুটিয়ার ন্যায় স্থূলকায় নহে। ইহাদের নাকের গঠন গারো, খাসিয়া, কুকিয়া, নাগা প্রভৃতি জাতির ন্যায় নহে। ইহাদের নাক অতি সুন্দর, ঠিক যেন কবি বর্ণিত 'তিল-ফুল-নাসা'। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা ইহারা সুন্দর ও সুশ্রী। মোটের উপর ইহাদের কোন খুঁত নাই। পুরুষের ন্যায় রমণীরাও সুন্দরী ও বলবতী। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা ক্ষেত্র কর্ষণাদি কার্য্য সম্পন্ন করে। আমরা "বারসালা" পৌঁছিলাম। এখানে নদীর উপর কাশ্মীরাধিপতির বিশ্রামার্থ একটী কাষ্ঠগৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। হিমালয়-পথে এরূপ কারুকার্য্যময় সুন্দর গৃহ আর নাই। গৃহের অলিন্দে ক্ষণকাল দাঁড়াইলে

নদীর খেলা অতি চমৎকার দেখা যায়, এবং জলকণা স্পৃষ্ট সুশীতল অনিলে শরীরের সমস্ত গ্লানি দূরীভূত হয়। আমরা বারসালায় কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। যে সকল রাস্তা মাঝে মাঝে বেশী উচ্চ সে সকল স্থানে ঘোড়ার উঠিতে বড় কষ্ট হয়, তাই আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া উচ্চ অথচ সোজা ও সরু রাস্তা দিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গ বাহিয়া রাজপথে আসিয়া অপেক্ষা করিতাম, এদিকে এক্কা-ওয়ালা গাড়ী লইয়া রাজপথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া আমাদের নিকটে পৌঁছিত। এই প্রকার রাস্তার উচ্চতা দৃষ্টে আমাদের প্রত্যহ গাড়ী হইতে নামিয়া তিন চারিবার পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া রাজপথে আসিতে হইত। আমরা ক্রমে "ডুলাই" উপনীত হইলাম। এই চটিতে একটি সুন্দর ডাক-বাংলা আছে। এখানে আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া রওনা হইলাম। আমরা হিমালয়-পথে একটী বানর ও একটী কাক ভিন্ন আর কোন পশু পক্ষী দেখিলাম না। যে হিমালয়ে সহস্র সহস্র শ্বাপদ নির্ভয়ে বিচরণ করে এবং পক্ষীসমূহের কাকলি শ্রবণে মন প্রাণ মোহিত হয়, সেই হিমালয়ে আমরা কিছুই দেখিতেছি না কেন, ইহা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করায়

লালা মূলরাজ উত্তর করিলেন—"একটী হিংস্র জন্তু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি আর রক্ষা আছে? পরমেশ্বরকে এজন্য ধন্যবাদ দেন।" হিমালয়ে যে কাক দর্শন করিলাম তাহা পাতিকাক। বঙ্গদেশের কাকের সহিত এই কাকের বর্ণ-বৈচিত্র ও অবয়বে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, তবে হিমালয়ের কাকের বিশেষত্ব এই, ইহাদের চক্ষের তারকা কিঞ্চিৎ শুভ্র; বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশলে ইহাতে ইহাদের সৌন্দর্য্যের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। আমরা অপরাহ্নে "রারা" পৌঁছিলাম। এই স্থানে "হংকং" নামে একটি ক্ষুদ্র বেগবতী নদী সহাস্যে ঝিলেম নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। রারাতে একটু বিশ্রাম করিয়া আমরা রওনা হইলাম। হিমালয়ে শিক্ষার বিষয় অনেক আছে। প্রত্যন্ত পর্ব্বত ও ছোট ছোট গণ্ডশৈল হইতে গগনভেদী অত্যুন্নত শৃঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া মানবের প্রকৃতি, পাপ, পুণ্য, রীতি, নীতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তনেরও অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ দণ্ডায়মান থাকিয়া নীরবে নিস্তব্ধভাবে বিধাতার কি এক মহৎ উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপন করিতেছে! জ্ঞান, সৌন্দর্য্য, প্রেম, উল্লাস, বিস্ময় প্রভৃতির এমন অপূর্ব্ব

সম্মিলন ভারতে বিরল ঘটে। হিমালয়ে আসিলে কত কথাই স্মৃতি-পথে উদিত হয়! ভাবের অনন্ত-প্রস্রবণ এখানে নিত্য বিকসিত; ধন্য স্থান! এস্থানে আসিলে বুঝি নাস্তিকও আস্তিক হয়, অপ্রেমিকও প্রেমিক হয়, এবং অবিশ্বাসীও ভাগবৎ-প্রেমে বিভোর হয়। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, দ্বিভূজ, ত্রিভূজ, চতুর্ভূজ প্রভৃতি যত রকমের পর্ব্বত কল্পনায় আসে, সমস্তই নয়নগোচর হইতেছে। এই দৃশ্য হিমাচল ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবে কি? হিমালয়ে টনেল বড় সুন্দর। রাল্লা হইতে ডোমেল যাইতে আমরা পথিমধ্যে দুইটি টনেল পার হইলাম। টনেল দুইটী নিতান্ত ছোট। এক একটী টনেল অনুমান তিনশত হাত দীর্ঘ এবং বার চৌদ্দ হাত প্রস্থ। আমরা সায়ংকালে "ডোমেলে" উপনীত হইলাম। ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উচ্চ। রাওলপিণ্ডি হইতে ডোমেল ৮৬ মাইল। এখানে একটী নূতন বড় ডাক-বাংলা অবস্থিত। ঝিলেম নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু আছে। এই সেতুর দুই পারে দোকান আছে। এখানে কাষ্টম হাউস্ আছে। আমাদের দ্রব্যাদি সমস্ত পরীক্ষিত হইল। কোহাল্লার ন্যায় এখানে কর আদায় হয়। প্রত্যেক

টঙ্গার. ট্যাক্স এক টাকা। ট্যাক্সের ভাড়া আমাদের পৃথক দিতে হইল না, এক্কাওয়ালা দিল। এখান হইতে মুজাফরাবাদ যাওয়ার এক রাস্তা আছে। আমরা পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নামিয়া একেবারে পাদদেশে আসিয়াছি, অতএব নদী তীরে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। এখানে প্রেম-বিহ্বলা কনিষ্ঠা "কিষণ গঙ্গা" (কৃষ্ণ গঙ্গা) আবেগে ছুটিয়া আসিয়া ভগিনী ঝিলেমের বক্ষে লুকাইয়াছে। দৃশ্য মনোহর। আমরা সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া দুই ভগি-নীর প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ-কোলাহল শ্রবণ করি-লাম। হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে প্রেমের এই পবিত্র চিত্র দেখিতে দেখিতে দয়াময়ের প্রেমে হৃদয় বিভোর হইল; উদ্বেগ, অশান্তি দূরে গেল, যেন নব-জীবন লাভ করি-লাম। লালা মূলরাজ ও আমি অনেক দিন পর আনন্দে নদীতে অবগাহন করিলাম। জল বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা। স্রোতবেগও অসাধারণ। বুকজলে নামিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে কাহার সাধ্য? আমরা কোন প্রকারে এক হাঁটু জলে ডুব দিলাম। হিম জলে অবগাহন করায় দেহ মন পবিত্র হইল ও হৃদয় শান্ত হইল। শুনিলাম কিষণ-গঙ্গার জল কৃষ্ণবর্ণ সেই জন্যই কৃষ্ণ-গঙ্গা নাম হইয়াছে। এখন বরফ গলিয়া সেই

জল ঝিলেমের সহিত মিলিত হওয়ায় ইহার স্বাভাবিক বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। শীতকালে ইহার বর্ণ অপেক্ষাকৃত কাল হয়। বন্ধু জগন্নাথ বড় দয়ালু। নিকটে একটী ধীবর মৎস্য ধরিতেছিল, তিনি তাহার নিকট হইতে কয়েকটী জীবিত মৎস্য খরিদ করিয়া জলে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার জীবের প্রতি এতাদৃশ দয়া দেখিয়া আমরা সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি ধীব-রের নিকট হইতে সমস্ত মৎস্য ক্রয় করিয়া বাঁচাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্তু ধীবর তাহার পরিশ্রম ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। এখানে যে সকল মৎস্য দেখিলাম তাহা বঙ্গদেশে পাওয়া যায় না। এ সকল মৎস্য শুধু পার্ব্বত্য নদীতেই জন্মিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে আমাদের বস্ত্রাদি পরী-ক্ষিত হইল। যদি কেহ নূতন বস্ত্র বা দ্রব্য সঙ্গে আনে তাহা হইলে কাষ্টম-হাউসের নিয়মানুসারে তাহাকে পৃথক শুল্ক দিতে হয়। আমাদের সঙ্গে নূতন বস্ত্রাদি না থাকায় আমরা শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইলাম। রাস্তায় কোন চটিতে কোন ফল পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়। অন্যান্য

চটির ন্যায় এখানেও দাল, রুটি প্রভৃতি আছে। আমার পঞ্জাবী বন্ধুরা সকলেই আহারাদি করিলেন, আমি দুগ্ধ পান করিলাম। সেতুর নিকটে একটী ছোট ঘর আছে। সেই ঘরে আমরা রাত্রিযাপন করিলাম। ঘরের এক পার্শ্বে পঞ্জাবী মহিলাগণ ও অন্য পার্শ্বে আমরা শয়ন করিলাম। আমরা অতি প্রত্যূষে ডোমেল হইতে রওনা হইলাম। একাওয়ালাদের প্রধান দোষ এই, তাহারা আরোহীকে একবার নামাইলে সহসা উঠাইতে চায় না, এবং রাস্তা একটু উচ্চ বা নিম্ন হইলেই নামাইয়া দিয়া থাকে। আরোহীকে নামাইবার কিন্তু নিয়ম নাই, তাহারা স্বেচ্ছানুসারে এইরূপে আরোহীকে বড় যন্ত্রণা দিয়া থাকে। যেখানে ঘোড়ার কষ্ট হয় সেখানে আমরা ইচ্ছা করিয়াই নামিয়াছি, তথাপি ইহারা সন্তুষ্ট নহে; ইহাদের যখন ইচ্ছা হইবে তখন নামিতেই হইবে। রাস্তায় অনেক লোককে একার পাছে পাছে প্রায় দুই তিন মাইল দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়াছি। একাওয়ালা আরোহীকে রাওলপিণ্ডি হইতে হিমালয়-পথে মোটের উপর প্রায় দশ বার মাইল কৌশলে হাঁটাইয়া আনে।

আমরা "মাজহে" নামে একটী ক্ষুদ্র চটি পাইলাম। এখানে ঘোড়া দুই মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রওনা

হইল। হিমালয়ের এই পথে গুহা খুব কম। তবে দুই একটী যাহা দেখিলাম তাহাতে ছোট রকমের একখানা ঘর বেশ ধরে। এই সকল গুহাতে অনেক সিদ্ধপুরুষ বাস করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা কোন মহাত্মার দর্শন পাইলাম না। আমাকে এক প্রকার লতা দেখাইয়া লালা মূলরাজ বলিলেন,—"এই লতা শত বৎসর পুস্তকে রাখিলেও ইহা যেমন আছে তেমনই থাকিবে। ইহা হিমালয় ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।" এই লতার পাতা দেখিতে অনেকটা আম্বলি পাতার ন্যায়। আমি ইহা তুলিয়া সাদরে আমার পকেট-ডায়েরীতে রাখিলাম। দ্বিপ্রহরে আমরা "গার্হিতে" আসিলাম। এখানে আমরা সৌরকরোদ্ভাসিত ঝরণার জলে স্নান করিয়া বড় শান্তি পাইলাম। পঞ্জাবীরা রুটি ভক্ষণ করিলেন, আমি অন্যান্য চটির ন্যায় এখানে দুগ্ধ পান করিলাম। এখানে একটী নূতন বড় ডাক-বাংলা আছে। এই বাংলা ডোমেলের বাংলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহা একটী ক্ষুদ্র টীলা অথবা পাহাড়ের উপর স্থাপিত হওয়ায় ইহার শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। গার্হি রাওলপিণ্ডি হইতে প্রায় ১০০ শত মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা আহারান্তে গার্হি হইতে রওনা হইলাম।

প্রিয় পাঠক, প্রকৃতির এই মহা-প্রদর্শনীতে, অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার এই হিমাচলে যাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাই দেখিতে পাইবেন। এস্থানে অগণিত দৃশ্য পরম্পরায় চক্ষু পরাস্ত হয় ও কল্পনা হার মানে। বৃক্ষরাজি ও লতামণ্ডপে পরিবেষ্টিত নানা পর্ব্বত শোভা পাইতেছে, আবার এক এক জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী পরিবৃত ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বতও আছে। কোথাও ফুলের পর্ব্বত, কোথাও ফলের পর্ব্বত, কোথাও লতার পর্ব্বত, কোথাও বা বৃক্ষের পর্ব্বত নীরবে দণ্ডায়মান আছে। জানি না ইহাতে ভগবানের কি মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। আমরা রক্ত-করবি ও গোলাপ ফুলের পর্ব্বত, দাড়িম্ব, নাসপাতি ও তুঁত ফলের পর্ব্বত, এবং দেবেক, চুনার, ঝাউ, সফেদা ও দেবদারু বৃক্ষের পর্ব্বত দেখিতেছি। এতদ্ভিন্ন আরও কত গাছ গাছড়া, লতা পাতার পর্ব্বত দেখিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের নাম আমি জানি না এবং পঞ্জাবীরাও অবগত নহেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই, যে পর্ব্বতে গোলাপ ফুল সেখানে শুধুই গোলাপ, অন্য ফুল নাই; যে শৈলে নাসপতি ফল, সেখানে শুধুই নাসপতি, অন্য ফল নাই; এই প্রকার সবগুলই ভিন্ন ভিন্ন ফল ফুলের পর্ব্বত। এ সকল

শৈলোৎপন্ন ফল ফুল সংরক্ষণের জন্য কোন প্রহরী নাই, ইহা স্বভাবজ। বন্য ফল ফুল যেমন কেহ আদর করে না, ইহারাও সেই প্রকার এই বিজন বিপিনে অনাদৃত অবস্থায় আপনি ফুটিতেছে, আপনি হাসিতেছে, আপনার সুগন্ধে আপনি মত্ত রহিয়াছে; আবার পথের পথিকও উপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া অভিমানে, মনের দুঃখে নীরবে আপনি ঝরিয়া পড়িতেছে। এ দৃশ্য হৃদয়-বিদারক। হিমাচল লীলাময়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-স্তম্ভ। মহাকবি শত বৎসরেও ইহার আংশিক বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন। একবার এই ব্রহ্মাবর্ত্তে আসিলে কোলাহল-পূর্ণ লোকালয়ে আর ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না। হিমগিরির অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে প্রাণ মাতিয়া উঠে, দগ্ধমরুবৎ তাপিতহৃদয় শান্ত হয় এবং অতি পাষণ্ডের অন্তরও শ্রীভগবানের অত্যাশ্চর্য্য মহিমায় অনুপ্রাণিত হয়।

আমরা অন্যান্য ফল ফুলের পর্ব্বতাপেক্ষা রক্ত-কম্বরী, নাসপাতি ও দেবদারু বৃক্ষের পর্ব্বতই বেশী দেখিতে পাইলাম। লালা মূলরাজের নিকট শুনিলাম, টিম্বার বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আমরা হিমালয়-পথে এই দন্তকাষ্ঠ প্রত্যহ ব্যবহার করিয়াছি। টিম্বারের ছাল চর্ব্বণ করিলে মরিচের ন্যায় একটু ঝাল লাগে,

[১১৫

অথচ দন্তের পক্ষে এই বৃক্ষের ডাল বড় উপকারী। এজন্য পঞ্জাবীরা টিম্বার বৃক্ষের অত্যন্ত যত্ন করে। দেরেক নামক বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠও মন্দ নহে। চুণার বৃক্ষের পাতা দেখিতে এরণ্ড পত্রের ন্যায়, কিন্তু আয়তনে ইহার চতুর্গুণ। এই বৃক্ষের একটা পত্রে আতপ-তাপ নিবারিত হয়। পঞ্জাবীরা বলিলেন, চুণারের যে প্রকার ঘন সন্নিবিষ্ট ছায়া পড়ে, কোন বৃক্ষের এ প্রকার ছায়া পড়ে না। প্রখর গ্রীষ্মকালে একবার এই বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিলে প্রাণ শীতল হয়। সফেদা বৃক্ষ শাল গাছের ন্যায় সরল ও ইহার ত্বক দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। এই বৃক্ষ দেখিতে বড় সুন্দর। দেবদারু বৃক্ষের শোভাও অনুপম। সমদূরবর্ত্তী ছোট ছোট দেবদারু বৃক্ষরাজি শৈল-বক্ষে সুসজ্জিত সৈনিকের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। সৈনিক বিভাগের নিয়মানুসারে ইহারা আকৃতি ও প্রকৃতিতে সকলেই সমান, কোনও প্রভেদ নাই। বঙ্গদেশে নাসপাতি মহার্ঘ, বড় বড় সহরে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু একটী নাসপাতির মূল্য তিন চারি পয়সার কম নহে। হিমালয়ে বন্য পশু পক্ষীও ইহা স্পর্শ করে না। নাসপাতি কে কত খাইবে? পর্ব্বতময় নাসপাতি

হিমালয়ে তুঁত নামক এক প্রকার ফল পাওয়া যায় তাহা কালজাম সদৃশ,কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহা অতি সুমিষ্ট ফল। বঙ্গদেশের গোলাপ অপেক্ষা হিমালয়ের গোলাপ অনেক বড়। ইহার একটী গোলাপ দর্শন ও আঘ্রাণ করিলে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে। যে পর্ব্বতে এইরূপ অগণিত গোলাপ সহস্র মুখে হাসিতেছে, যাহার সৌরভে পর্ব্বতপ্রদেশ আমোদিত, যে হিমাচল অনন্ত শোভার ভাণ্ডার, লীলাময়ের চির-লীলাভূমি, হিমালয়বাসিনী মা ভগবতীর প্রিয় নিকেতন, বাস্তবিক তাহা ভক্তির অনন্ত প্রস্রবণ এবং জ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব্ব সম্মিলন-ক্ষেত্র। ফলতঃ এই পূত-প্রদেশ দেবাদি-দেব মহাদেবের বিলাস-কানন; ইহার অতুলনীয়া শোভা প্রকৃতই "স্বর্গাদপি গরীয়সী"। আমরা অপরাহ্নে "হড়ি" পৌঁছিলাম। হড়ি রাওলপিণ্ডি হইতে ১১০ মাইল। এই স্থান সাগর-জল হইতে ৩০০০ ফুট উচ্চ। আমরা একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" হিমালয়ে আসিয়া আমরা ইহার সত্যতা বেশ অনুভব করিলাম। ধূসরবর্ণ পর্ব্বতগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। আমরা এত উচ্চে উঠিয়াছি, যে মেঘ সকল আমাদের নিম্নস্থান দিয়া ধাবিত হইতেছে। ইহা এক

অভিনব দৃশ্য! বাল্যকাল হইতেই মেঘ মস্তকের উপরেই দেখিয়া আসিতেছি, নিম্নে কথনও দেখি নাই, ভগবানের কৃপায় হিমাচলে বসিয়া তাহাও দেখিলাম। প্রত্যুতঃ মেঘমালা গিরিরাজ হিমালয়ের চূড়া লঙ্ঘন ভয়ে যেন নিচু হইয়া চলিয়াছে। হিমালয়ের দৃশ্যাবলি এমন চমৎকার যে এই পথে শতবার আসিলেও ইহার দৃশ্য-পরম্পরা দর্শনে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয় না।

ঝিলেম নদীতে সর্ব্বদা অগণিত 'কাষ্ঠখণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে। এ সকল কাষ্ঠ দূরস্থিত পাহাড় পর্ব্বত হইতে স্রোতে ভাসাইয়া আনিতেছে। অসংখ্য কাষ্ঠখণ্ডে নদী জল আবৃত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে নদী-গহ্বরে বৃহৎ প্রস্তর থাকায় নদী জল সেই স্থানে স্ফীত হইয়া প্রস্তরের দুই ধার দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং কাষ্ঠগুলি প্রস্তরের সহিত বেগে ধাক্কা লাগিয়া এক' একবার দণ্ডায়মান হইয়া উঠিতেছে। এ দৃশ্য মন্দ নহে। পঞ্জাবীরা সর্ব্বদাই এই দৃশ্য দেখিয়া বড় আমোদ বোধ করিতেন ও আমাকে দেখাইতেন। হিমালয়-পথে ঝিলেম নদীতে কোন নৌকা দেখিলাম না; ইহার কারণ এই, অসাধারণ স্রোতবেগে নৌকা স্থির থাকিতে পারে না এবং পর্ব্বতে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া

যায়। হিমালয়ের মধ্যে এই নদীতে তরঙ্গ বা আবর্ত্ত নাই।

আমরা সায়ংকালে "চুণারী" নামক চটিতে উপনীত হইলাম। আমরা রাস্তায় এত নাসপাতি ফল দেখিতেছি, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কোন চটিতে নাসপাতি অথবা অন্য কোন ফল পাওয়া যায় না।

আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হিমালয়ে চন্দ্র কিরণ কেমন দেখা যায়। তদুত্তরে এই বলিয়াছি,—আমাদের দেশে জ্যোৎস্না যেমন প্রফুল্লময়ী হিমালয়েও সেইরূপ। হিমালয়ের বায়ু অপেক্ষাকৃত পাতলা বশতঃ আমরা চন্দ্রালোকে অধিকতর সৌন্দর্য্য অনুভব করিব আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না; হিমাচল লতা, বৃক্ষ ও পর্ব্বতে এমন গাঢ় সমাচ্ছন্ন যে এ সকল ভেদ করিয়া চন্দ্রকিরণ সকল স্থানে পৌঁছিতে অসমর্থ। আজ দশমীর চন্দ্র বৃক্ষান্তরাল হইতে এক একবার উঁকি ঝুকি মারিয়া আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে; এতদ্দর্শনে আমরা পুলকিত হইলাম।

অন্যান্য চটির ন্যায় চুণারীতে আহার্য্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে শয়ন-গৃহ মিলে না। তাই বাধ্য

হইয়া পঞ্জাবীরা সকলে একটী পরিষ্কৃত স্থানে খাটুলি সংগ্রহ করিয়া শয়ন করিলেন; আমি ঠাণ্ডা লাগিবার আশঙ্কায় একার ভিতর শয়ন করিলাম। লালা মূলরাজ স্বহস্তে কম্বল দ্বারা একার চতুর্দ্দিকে আবৃত করিয়া দিলেন। আমি প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার এইরূপ উদারতার পরিচয় পাইয়াছি।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যুষে আমরা চুণারী হইতে রওনা হইলাম। চুণারী ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে একটী বৃহৎ জল-প্রপাত দৃষ্টিগোচর হইল। হিমালয়-পথে যে দুই তিনটী জল-প্রপাত দেখিয়াছি তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাব নাম "Pratap-Fall." উচ্চ পর্ব্বত হইতে স্তম্ভের ন্যায় স্থূল হইয়া গম্ভীর গর্জ্জনে পর্ব্বতের সানুদেশে তীব্রবেগে জল পতিত হইতেছে এবং তথা হইতে জল গড়াইয়া নিম্নে ঝিলেম নদীর সহিত মিশিতেছে। এই দৃশ্য বড় সুন্দর! আমরা অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলাম, শীঘ্র চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হইল না। ইহা দর্শন করিয়া আফ্রিকার নায়েগ্রার ভীষণ জল-প্রপাতের কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিল। এই সামান্য জল-প্রপাত দর্শন করিলেই যখন একটু ভীতির সঞ্চার হয়, তখন নায়েগ্রা দর্শনে দর্শকের যে কি অবস্থা

হয় তাহা বলা যায় না। এই জল-প্রপাতের নিকট একটী সেতু আছে, তাহার নাম "Pratap-Fall Bridge".

আমরা পথিমধ্যে চারি পাঁচ শত অশ্বতরের গাড়ী দেখিলাম। প্রত্যেক গাড়ী নানা প্রকার দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ। শুনিলাম উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে এই রসদ যাইতেছে। এই সঙ্গে পদাতিক সৈন্য আছে। রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এই শকটগুলি প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া আমাদের পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্জাবীরা খাট্‌লিকে মঞ্জি বলে। পঞ্জাব এবং যুক্ত-রাজ্য সর্ব্বত্রই মঞ্জি ব্যবহৃত হয়। হিমালয়ে সকল চটিতে মঞ্জি পাওয়া যায় না। আমরা কয়েকটী বড় বড় চটিতে মঞ্জি পাইয়াছি। হিমালয়ে দিবাভাগে দুই এক ঘণ্টার জন্য মঞ্জিতে বিশ্রাম করিলে এক পয়সা ভাড়া লাগে এবং রাত্রিকালে শয়ন করিলে এক রাত্রির ভাড়া দুই পয়সা কি চারি পয়সা।

আমরা সূর্য্যোদয়ে "চগোটী" নামক চটিতে আসি-আসিলাম। চগোটী রাওলপিণ্ডি হইতে ১২৪ মাইল। এস্থানে একটী ডাক-বাংলা আছে, কিন্তু ইহা বলবাসের

উপযুক্ত নহে। এখানে রুটী পাওয়া যায় না। এই চটি হইতে ঝিলেম নদী শত শত ফুট নিম্নে প্রবাহিত হইতেছে। আমরা এখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া রওনা হইলাম। রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর যাইতে হিমালয়ের মধ্য দিয়া অনেক পঞ্জাবী পদব্রজে যাতায়াত করে। আমরা রাজপথে মাঝে মাঝে দুই একটী পঞ্জাবী স্ত্রীলোককে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে দেখিলাম। দুই চারি জন সাধু সন্ন্যাসীও দেখা গেল। ইঁহারা অমরনাথ তীর্থের যাত্রী। এই তীর্থ কাশ্মীরের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। অমরনাথ শ্রীনগর হইতে পাণ্ডারগাঁও দিয়া পাঁচ দিনের পথ। কাশ্মীরের মহারাজার অনুমত্য-নুসারে প্রতি বৎসর কেবল রাখী-পূর্ণিমার দিবস অমর-নাথ শিব দর্শন করিতে পারা যায়। কাশ্মীর হইতে সমস্ত যাত্রী সমবেত হইয়া অমরনাথ যাত্রা করে। এই দুর্গম পথে সাধু সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য যাত্রীর সংখ্যা অতি কম।

আমরা বেলা দশ ঘটিকার সময় "উড়ি" পৌঁছিলাম। রাওলপিণ্ডি হইতে উড়ি ১৩৭॥ মাইল। এখানে কাশ্মীরা-ধিপতির একটী ছোট দাতব্য-চিকিৎসালয় আছে। অবিশ্রান্ত ভ্রমণ এবং অনাহারে শরীর অসুস্থ হওয়ায় ঐ চিকিৎসালয়ে ঔষধ আনিতে গেলাম। সময়াতীত হওয়ায়

ডাক্তার বাবু তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবু না থাকায় কম্পাউণ্ডার ঔষধ দিতে প্রথমতঃ একটু আপত্তি করিয়াছিলেন, অবশেষে আমার অপেক্ষা করিবার সময় নাই শুনিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কি ঔষধ দিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমার নিকট সরলচিত্তে প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার সরলতায় সন্তুষ্ট হইলাম এবং স্বয়ং ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। বলা বাহুল্য, ডিস্‌পেন্সিরি ভিন্ন হিমালয়ে অন্য কোন স্থানে শিশি পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই ডিস্‌পেন্সেরিতে শিশি সংগ্রহ না হওয়ায় কেবল একমাত্রা ঔষধ সেবন করিয়া চলিয়া আসিলাম।

উড়িতে "পীর-পর্ব্বত" দেখা গেল। পীর পর্ব্বতের দৃশ্য চমৎকার। সমস্ত পর্ব্বত রৌপ্যময়। রৌপ্য শৃঙ্গ হইতে ধীরে ধীরে বরফ গলিয়া পড়িতেছে। এই দৃশ্য দেখিলে প্রাণ শীতল হয়। বাস্তবিক এই মনোহর দৃশ্যে আশাতীত আনন্দলাভ করিলাম, স্রষ্টার অত্যাশ্চর্য্য মহিমা দর্শন করিয়া ভক্তিতে হৃদয় আপ্লুত হইল এবং দয়াময় এই অধমের প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক কত অভিনব দৃশ্য দেখাইলেন; ইহা চিন্তা করায় আনন্দাশ্রু নির্গত হইল।

কাশ্মীরে ঋতু পরিবর্ত্তন অতি সুন্দর। বসন্তাগমে যখন বরফ গলিতে থাকে, তখন শোভার অনন্ত সৌন্দর্য্য চারিদিকে জাগিয়া উঠে। ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী কৃপারাম কাশ্মীরের বরফ পড়ার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"না বরফ অস্তঙ্গকে মেবারস্ সরেপীর।
ফলক তোফ্‌মে জনদ্ বররুয়ে কাশ্মীর॥"

অর্থাৎ পীর পর্ব্বতের উপর যে বরফকণা পতিত হয়, তাহা দেখিলে বোধ হয়, আকাশ কাশ্মীরের মুখে অমৃত দান করিতেছে।

লালা মূলরাজ আমাকে উড়ীতে একটী পুরাতন দুর্গ দেখাইলেন। ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিলাম না। অন্যান্য চটি অপেক্ষা এই চটি কিছু বড়। এখানে চারি পাঁচটী দোকান ঘর আছে এবং নূতন বড় বাংলা আছে। এই চটির নৈসর্গিক দৃশ্য বড় সুন্দর। আমরা আহারাদি সমাপন করিয়া উড়ি ত্যাগ করিলাম। যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাবে হিন্দুমাত্রেই শিখা রাখে। আমার শিখা নাই দেখিয়া পঞ্জাবী বন্ধুরা আমাকে কয়েকদিন ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে, আমার আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের এই ভ্রমাত্মক ধারণা দূর হইয়াছিল।

আমরা বেলা দুই ঘটিকার সময় "রামপুর" নামক চটিতে উপনীত হইলাম। রামপুর রাওলপিণ্ডি হইতে ১৫১ মাইল। এখানে একটী তুঁত বৃক্ষ দেখিয়া লালা মূলরাজ স্বহস্তে অনেকগুলি তুঁত ফল পাড়িয়া আমাকে বলিলেন,—"এই ফল খাইলে আপনার শরীর শীতল হইবে এবং আপনি বেশ আরাম বোধ করিবেন।" বস্তুতঃ তাহাই হইল; উড়িতে ঔষধ খাইয়া কিছু উপকার বোধ করিয়াছিলাম, এখানে তুঁত ফল ভক্ষণ করায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত উপদ্রব কমিয়া গেল। এই হিমাচল দুরারোগ্য ব্যাধি উপশমমার্থ কত অসংখ্য গাছ গাছড়া বক্ষে ধারণ করিয়া আছে, আমরা কি তাহার কোন সন্ধান রাখি? যে সকল মহাজন সর্ব্বদা এই পথে গমনাগমন করেন, শুধু তাঁহারা এই সকলের কথঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন।

রামপুরে একটী পুরাতন ডাক-বাংলা আছে। আমরা এখান হইতে রওনা হইলাম। লালা মূলরাজের পুত্র সরদারলাল বড় অশান্ত। সে সর্ব্বদাই আমাকে বিরক্ত করিত। কখন ক্রন্দনের ভাণ করিত, কখন আমাকে চিমটি কাটিত, কখন বা আমি মারিয়াছি বলিয়া তাহার পিতার নিকট নালিশ করিত। তাহার পিতা আমার

নিষেধ সত্ত্বেও এ জন্য তাহাকে সর্ব্বদা শাসন করিতেন, তথাপি বালক তাহার দুষ্টামি ত্যাগ করিত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, রাস্তায় পর্য্যটনে এই বালক ক্লান্ত বোধ করিত না। ধন্য পঞ্জাবীর সহিষ্ণুতা। শিশুকাল হইতে তাহাদের দেহ এই প্রকারেই গঠিত হয়। লালা জ্ঞান-চাঁদ এক বৎসরের একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন, ইহাতে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম।

আমরা "বানৈয়ার" নামক একটী ক্ষুদ্র চটিতে উপ-স্থিত হইলাম। এই চটির সন্নিকটে একটী [illegible] প্রাচীন মন্দির দেখা গেল। লালা [illegible]রাজ বলিলেন,—"কিম্বদন্তী এই, ইহা কুরু-পাণ্ডবের মন্দির"। মন্দিরের আয়তন ও প্রাচীনত্ব বোধে আমরা এ কথা একেবারে উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। এই চটিতে খাদ্যদ্রব্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না। আমরা এখানে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া রওনা হইলাম। আমরা উড়ি হইতে ক্রমে নিম্নাভিমুখে নামিতেছি। এখন আর হিমালয়ের গগনভেদী পর্ব্বতমালা দেখা যায় না, ক্রমশঃ ছোট ছোট পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ ত্যাগ করিয়া সমতল ভূমিতে কাশ্মীরের উপত্যকায়

"বারামুল্লা" নামক একটী জেলায় সায়ংকালে উপনীত হইলাম। বারামুল্লা রাওলপিণ্ডি হইতে ১৬৬ মাইল। বারামুল্লায় ঝিলেম নদী বিস্তৃত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। হিমালয়ের মধ্যে যে প্রকার গভীর গর্জ্জন শুনিয়াছি, এখানে তদ্রূপ কিছুই শ্রুত হইল না। এখানে নদী প্রশান্ত,—উদ্বেল ও কোলাহল শূন্য। নদীর দুই পারেই সহর। ঝিলেম নদীর উপর একটী সেতু আছে। নদীতে নৌকার অভাব নাই। বারামুল্লা হইতে শ্রীনগর দুই দিনে নৌকায় যাওয়া যায়। সহরটী ছোট হইলেও সুদৃশ্য। এখানে একটী দেবালয় আছে। কোন পথিক বারামুল্লা উপস্থিত হইলে পাণ্ডারা তাহাকে দেবালয় দর্শন করিতে বিশেষ অনুরোধ করে। আমার ঐ দেবালয় দর্শন করার বাসনা ছিল, কিন্তু রাত্রিকালে আমার বন্ধুরা দেবালয়ে যাইতে স্বীকার করিলেন না, এবং আমাকেও নিষেধ করিলেন। পঞ্জাবীরা সকলে হোটেলে বিবিধ আহার্য্যে পরিতৃপ্ত হইলেন। আমি এখানেও দুগ্ধ পান করিলাম, কারণ এখানে চাউল পাওয়া গেলেও রাত্রিকালে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আহার করা বড় অসুবিধা। আমরা আহারান্তে কাষ্ঠের দ্বিতল-গৃহে শয়ন করিলাম। চটির ন্যায় এখানে আর শয়নের কোন অসুবিধা রহিল না।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে আমরা বারামুল্লা হইতে রওনা হইলাম। হিমালয়ের অসমতল রাস্তা ত্যাগ করিয়া বারামুল্লা হইতে বরাবর সমতল রাস্তা দিয়া চলিলাম। এখন আর রাজপথ কোথাও উচ্চ বা নীচ নহে। হিমালয়ের শৃঙ্গমালা আমাদের দক্ষিণে এবং পশ্চাতে মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে, বাম পার্শ্বে নদী; দৃশ্য মনোরম। বারামুল্লা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত রাজপথের দুই ধারে সারি সারি অগণিত বৃক্ষশ্রেণী সৈনিকের ন্যায় দাঁড় রহিয়াছে। ইহাতে রাজপথের শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। দুই দিকে বৃক্ষ থাকাতে পথিককে আতপ-তাপে কোন কষ্ট পাইতে হয় না।

আমরা বেলা দশ ঘটিকার সময় "পুটান" পৌঁছিলাম। রাওলপিণ্ডি হইতে পুটান ১৮০ মাইল। এখানে একটী সরাই আছে। এখানে সকলে আহারাদি করিলেন; আমি পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ পান করিলাম। পুটান হইতে "গুলমার্গ" একটী রাস্তা গিয়াছে। সমগ্র কাশ্মীরের মধ্যে গুলমার্গের স্বাস্থ্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। বহু ইংরাজ এখানে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনার্থ গ্রীষ্মকালে আসিয়া থাকেন। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমণ্ডিত গুলমার্গের নৈসর্গিক দৃশ্য নয়ন-মুগ্ধকর। আমরা বারামুল্লা হইতে পুটান

আসিতে একটী রাস্তা দেখিলাম। এই রাস্তা "গিলঘিট্" গিয়াছে। গিলঘিট্ কাশ্মীরের একটী জেলা। এখানে বৃহৎ সেনা-নিবাস আছে। এ স্থানটি ভারতের সীমান্ত, সুতরাং এ স্থানে ব্রীটিশ সৈন্য আছে।

আমরা পুটান হইতে রওনা হইলাম। বারামুল্লা হইতে চারিদিকে কেবল ধান্য-ক্ষেত্র দেখিয়া আসিতেছি। কাশ্মীরে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মে। এ সকল স্থান অনেকটা বাঙ্গালার মত। হিমালয় ছাড়াইলে মনে হইল আমরা বঙ্গদেশে পৌঁছিয়াছি। কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট ছোট অসংখ্য রক্তবর্ণের সুন্দর পুষ্প দেখিলাম। ইংরাজ কবিরা ইহা বড়ই ভালবাসেন। প্রাচীন ইংরাজ কবিদিগের গ্রন্থে এই পুষ্পের বর্ণনা পাওয়া যায়।

রাস্তার মাঝে মাঝে কাশ্মীরী বালকগণ ঠোঙ্গায় করিয়া তুঁত ফল হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোন গাড়ী নিকটে আসিলে তাহারা দৌড়িয়া যায় ও তুঁত ফল বিক্রয় করিয়া দুই একটী পয়সা লইয়া চলিয়া আসে। লালা জগন্নাথ বালক-সুলভ চপলতা বশতঃ তুঁত ফলের ঠোঙ্গা ক্রয় করিবে বলিয়া পরিহাসচ্ছলে তাহাদের হস্ত হইতে ঠোঙ্গা কাড়িয়া লইত এবং দুই চরিটী ফল ভক্ষণ করিত।

বালকেরা ক্রন্দন করিতে করিতে গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর দৌড়িয়া আসিলে ঐ ঠোঙ্গা ফেরত দিত এবং একটী পয়সা দিয়া বিদায় করিত। লালা জগন্নাথ তুঁত ফলের বড় এক ঠোঙ্গার মূল্য কত জিজ্ঞাসা করিলে বালকেরা বলিত "থাম পোস্" (থাম পোস্ কাশ্মীরী শব্দ) অর্থাৎ দুই পয়সা। এ দেশে সকলেই তুঁত ফল বড় ভালবাসে।

আমরা পথিমধ্যে কাশ্মীরাধিপতির প্রায় তিন চারি শত অশ্বারোহী সৈন্য দেখিলাম। সৈন্যেরা সকলেই ব্রীটিশ সৈন্যের ন্যায় সুসজ্জিত এবং অশ্বগুলি বলবান। আমরা বেলা তিন ঘটিকার সময় কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর উপনীত হইলাম।

রাওলপিণ্ডি হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে কেবল অনন্ত পর্ব্বতমালা! নিরাশ্রয় আমরা, অনেক সময় মনে করিতাম—"এই পর্ব্বত-সমুদ্রের বোধ হয় কুল কিনারা নাই,—চিরকাল ভ্রমণ করিলেও বোধ হয় ইহা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।" অবশেষে নিরাপদে শ্রীনগর পৌঁছিলে শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ভাবিলাম,—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥"

বাঁসিয়ায় আমরা এক্কাওয়ালাকে সন্তুষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, বোধ হয় ইহা পাঠকের স্মরণ আছে। শ্রীনগর পৌঁছিলে অবশিষ্ট মুদ্রা দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। এক্কাওয়ালা সেলাম ঠুকিয়া তাহার এক্কা লইয়া চলিয়া গেল, আমরাও পাঁচ ছয়দিনের নিরবচ্ছিন্ন যোগাসন হইতে মুক্তিলাভ করিলাম।

স্বেতস্বিনী ঝিলেম নদীর তীরে এক অতি রমণীয় বিস্তীর্ণ গোলাপ-উদ্যান। সেই মনোহর উদ্যানোপকণ্ঠে দারুনির্ম্মিত সুসজ্জিত দ্বিতল গৃহে কাশ্মীরের ডিপুটী কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল কর্ণেল অনন্তরামের বাসা। কর্ণেল অনন্তরামের পুত্র লালা জগন্নাথের সহিত আমরা তাঁহার বাসায় সমাদৃত হইলাম।

কাশ্মীরের সৈনিক-বিভাগে কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল পদটি বিশেষ সম্মানজনক। তন্নিম্নে ডিপুটী কোয়ার্টার মাষ্টার জেনারেল। অতএব পঞ্জাব-নিবাসী ক্ষত্রিয়বংশ-সম্ভূত কর্ণেল অনন্তরাম কাশ্মীরের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। ইঁহার চরিত্র নির্ম্মল এবং হৃদয় মহৎ। আমি বিদেশী ও সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও ইঁনি আমার সহিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহার কথা আমি জীবনে ভুলিব না।

এখানে আসার পর আমার কোন অসুবিধা রহিল না। আমি স্বহস্তে অভিলাষানুরূপ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতাম। বস্তুতঃ গৃহস্বামীর যত্নে আমি পঞ্জাবীবন্ধুগণের সহিত একত্রে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলাম।

অভ্রংলিহ গিরিরাজ হিমালয়ের সানুদেশে উপত্যকা-ময় স্থানে অপ্সর-নগরী কাশ্মীর অবস্থিত। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। যে সকল সামন্ত-প্রদেশ প্রকৃতি রাণীর লীলা-নিকেতন বলিয়া বিখ্যাত, কাশ্মীর তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীনগরের উচ্চতা ৪১০০ ফুট এবং দৈর্ঘ্য তিন মাইল। ঝিলেম নদীর উৎপত্তি স্থান শ্রীনগর হইতে বোধ হয় চল্লিশ মাইল ব্যবধান। ঝিলেম শ্রীনগরের মধ্য দিয়া অধিকাংশ গৃহের এবং রাজহর্ম্ম্যের ভিত্তিমূল স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীনগর ঝিলেমের উভয় তীরে সংস্থিত। এই উভয় তীরস্থ নগরদ্বয়ের একী-করণার্থ ঝিলেমের উপর সাতটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ঝিলেমের বামতীরে রাজ-প্রাসাদ। এই প্রাসাদের মধ্য-ভাগের দৃশ্য মন্দ নহে,কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী অংশের গঠনপ্রণালী তত সুন্দর দেখায় না। আমার নিকট জম্বু নগরীর অট্টালিকা ইহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বোধ হইল।

কাশ্মীরের কাষ্ঠ-গৃহ একটী দেখিবার জিনিষ। এখানে অধিকাংশ গৃহ কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং কারুকার্য্য পূর্ণ। মাঝে মাঝে ত্রিতল চৌতল গৃহ দৃষ্ট হয়। এখানকার দারু-শিল্প অতি সুন্দর। বিগত ১৩১৮ সনের দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কাশ্মীরাধিপতির শিবির তোরণ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়ায় মহারাজা সেই তোরণ তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন, এবং সম্রাট্ তাহা সাদরে স্বদেশে লইয়া গিয়াছেন। কাষ্ঠ-শিল্পের ন্যায় প্রস্তর শিল্পেও কাশ্মীরীগণ সুনিপুণ।

বর্ত্তমান সময়ে জম্বু ও কাশ্মীরের লোক সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ এবং আয়তন আশী হাজার বর্গ মাইল। এই দেশ হায়দ্রাবাদ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত করদরাজ্য অপেক্ষা আয়তনে বড়। রাজস্ব সাড়ে সাতষট্টি লক্ষ টাকা। জম্বু ও কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ জন মুসলমান, অবশিষ্ট হিন্দু ও শিখ। কাশ্মীরী পণ্ডিত, ক্ষেত্রী বা বোরা বা পনসারী, এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হিন্দু দ্বারা হিন্দু-সমাজ গঠিত। সমস্ত দেশে, সমস্ত সহরেই সৎ ও অসৎ এই উভয় শ্রেণীর লোক আছে; এখানেও আছে। কিন্তু কাশ্মীরী গ্রামবাসীদের ব্যবহার এমন সরল ও

অমায়িক যে তাহা দেখিয়া বোধ হয়, ইহারা কলিযুগের লোক নহে। কাশ্মীরী ছাত্রগণ বুদ্ধিমান ও স্মৃতি-শক্তি-সম্পন্ন। এখানে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং অনেক দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "রাজ-তরঙ্গিনী" পাঠে কাশ্মীরের অনেক মৌলিক-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ব্রহ্মপুরাণে কাশ্মীর "উদিচ্য দেশ" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

কাশ্মীরের ব্রাহ্মণকে "পণ্ডিত" কহে। তাই বলিয়া কাশ্মীরের সকল ব্রাহ্মণই পণ্ডিত নহে। যে সকল পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ কাশ্মীর আসিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হন না। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কাশ্মীর হিন্দুরাজার অধীনে ছিল। পরে প্রায় চারিশত বৎসর মুসলমানের শাসনাধীন থাকায় অধিকাংশ ব্যক্তি ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। যে সকল ব্রাহ্মণ গোপনে জাতীয় ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা এখন কাশ্মীরী পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত। এখানে পণ্ডিত বলিলে আমাদের দেশের ন্যায় কেবল বিদ্বান্ ব্যক্তিকে বুঝায় না। পণ্ডিতের মধ্যে অধিকাংশই মূর্খ-পণ্ডিত; তবে পণ্ডিত পণ্ডিতও না আছেন এমত নহে; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা কম। পণ্ডিতেরা শিল্পকার্য্য ও ব্যবসায়াদি করা অপবিত্র এবং ঘৃণাজনক

মনে করে। সেই হেতু তাহারা সংস্কৃতানুশীলন ও জ্যোতিষ-চর্চ্চা দ্বারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এ জন্য তাহাদের আর্থিক অবস্থার বড় উন্নতি হয় না। বাহ্য-দৃষ্টিতে কাশ্মীরী পণ্ডিত ও মুসলমানের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। পোষাক পরিচ্ছদ উভয়েরই প্রায় একরূপ। উভয়েই ঢিল পাজামা, লম্বা শার্ট ও পাগ্‌ড়ি ব্যবহার করে। তবে পণ্ডিতেরা অনেকে ধুতি পরে এবং কপালে রক্তচন্দন ও জাফরানের বৃহৎ তিলক ধারণ করে। পণ্ডিতেরা ভেড়ার মাংস খাইতে বড় ভাল বাসে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা লম্বা শার্ট ও পাজামা ব্যবহার করে। পণ্ডি-তেরা সকলেই দুর্গাপূজা এবং শিবরাত্রি ও জন্মাষ্টমী ব্রত করে।

কাশ্মীরী হিন্দুদিগের মধ্যে ক্ষেত্রী, বোরা বা পনসারা একটী জাতি বিশেষ। সমস্ত মুদী দোকান ইহাদের একচেটিয়া, এ জন্য ইহাদিগকে পসারী বা পনসারী কহে। ইহাদের আর্থিক অবস্থা পণ্ডিতদের অপেক্ষা অনেক ভাল। আচার ব্যবহার এবং পোষাক পরিচ্ছদে ইহারা প্রায় পণ্ডিতদিগের তুল্য।

কাশ্মীরী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে হাঁজি জাতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। নাগরীকগণের দৈনন্দিন আবশ্যকীয়

অনেক কার্য্যে ইহারা লিপ্ত থাকে। কার্য্যভেদে তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহ মজুরী খাটিয়া, কেহ ধান্ত বিক্রয় করিয়া, কেহ বজরা ভাড়া দিয়া, কেহ জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিয়া, কেহ হ্রদ হইতে শাক সব্জী আনিয়া কেহ পাথর কাটিয়া, কেহ ফেরি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। এই সমস্ত ব্যবসায়ে যোগদান করিলেও তাহারা বঙ্গদেশের মাঝির ন্যায় প্রধানতঃ নৌকার কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকে। গত পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রচলন হয়; তখন অধিকাংশ হাঁজি হিন্দু-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আমীর কাড়াল, শ্রীনগরের তৃতীয় সেতু, গান্ধারবল প্রভৃতি স্থানে ইহাদের আড্ডা আছে।

হাঁজি জাতির মধ্যে সুন্দরীর অভাব নাই। ঘরে ঘরে অপ্সরা তুল্য রূপসী দৃষ্ট হয়। হাঁজি রমণীগণ ধানভানা, গৃহস্থালী ও কৃষিকর্ম্মে নিপুণা। পুরুষ সাধারণতঃ শ্বেত-বর্ণের এবং রমণী কৃষ্ণ বা গাঢ় নীলবর্ণের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। রমণীদিগকে এই বেশে অনেক সময় ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃতা দেখা যায়। যুবতীগণ রক্তবর্ণ পরিচ্ছদের অনু-রাগিণী। কুমারীগণ শ্রেণীবদ্ধ বেণী রচনাপূর্ব্বক কেশ সংস্কার করে। ইহা তাহাদের কৌমার্য্যের লক্ষণ। নৌকাওয়ালা

ইংজি-রমণীদের নৈতিক-চরিত্র নিতান্ত কুৎসিত। অর্থ-লোভে তাহারা পবিত্র নারী ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও পরাঙ্মুখ হয় না। যুবতীরা অনায়াসেই ইউরোপীয়-দের উপভোগ্য হইয়া পাপ জীবন অতিবাহিত করে।

কাশ্মীরী স্ত্রীলোকের মধ্যে পূর্ব্বে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং এখনও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অন্তঃপাতী লাদক (Ladakh) এবং অন্যান্য স্থানে এই নিয়ম প্রচলিত আছে।

শ্রীনগর হইতে বার চৌদ্দ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ ক্ষীর-ভবাণী তীর্থ বিরাজমান। এখানে একটী পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণী-তীরে মন্দির মধ্যে ক্ষীরভবানী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তি কাশ্মীরী পণ্ডিতের আরাধ্য দেবতা। জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এখানে ধুমধামের সহিত পূজা হয়।

কাশ্মীরে অন্ন প্রধান খাদ্য। পুরি বা লুচি খাওয়ার প্রথা কাশ্মীরে নাই। পরিপাটিরূপে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে সে স্থানের অধিবাসীগণ সিদ্ধ-হস্ত। এখানে খাদ্য দ্রব্যাদি অতিশয় সুলভ। এক মণ চাউল অথবা আঁটার মূল্য মাত্র দুই টাকা। খুব উৎকৃষ্ট একমণ চাউলের মূল্য তিন টাকা মাত্র। কি সোণার

দেশ! কাশ্মীর মহারাজার আদেশানুসারে তথাকার উৎপন্ন দ্রব্য ভিন্ন দেশে রপ্তানি হয় না; সমস্ত দ্রব্য অতি সুলভ হওয়ার ইহাই প্রধান কারণ। কাশ্মীরে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় তাহা তথাকার পক্ষে প্রচুর। এখানে এক পয়সায় শাক-সব্জী এত প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায় যে একটী লোক তাহা কষ্টে বহন করিতে পারে। মাসিক তিন টাকা ব্যয় করিলে এক ব্যক্তির আহারাদি অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয়। এখানে নানা প্রকার পার্ব্বতীয় ফল পাওয়া যায়; কিন্তু দুঃখের বিষয়—আমাদের বঙ্গীয় ফল রম্ভা, পনস, নারিকেল প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কাশ্মিরীগণ কুল্‌চা নামক এক প্রকার সুখাদ্য বিস্কুট খাইতে ও চা-পান করিতে বিশেষ অভ্যস্ত। দৈনিক ইহারা তিন চারিবার চা-পান করে।

কাশ্মীরের নৌগৃহ (Living Boat) বা বজরা একটী প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। প্রত্যেক বজরায় অনেকগুলি কামরা থাকে। এই কামরাগুলি বেশ পরিষ্কার। এই বজরার সঙ্গে ছোট নৌকা থাকে, তাহাতে বজরাওয়ালা সপরিবারে বাস করে। প্রত্যেক নৌগৃহের ভাড়া সাধারণতঃ চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা হইয়া থাকে।

শ্রীনগরে অনেকগুলি বাগ আছে যথা,—মুন্সীবাগ, সোণোয়ার-বাগ, নিশাৎ-বাগ, সলিমার-বাগ, চিনার-বাগ ইত্যাদি। সলিমার-বাগ লাহোরের প্রসিদ্ধ সলিমার উদ্যানের আদর্শে প্রস্তুত। এই সকল বাগ দেখিবার জিনিস।

শ্রীনগরের সংলগ্ন একটী প্রকাণ্ড মাঠের প্রান্তভাগে শঙ্করাচার্য্য-পর্ব্বত বিদ্যমান। পর্ব্বতের উপর একটী মন্দির আছে, ইহা শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত বলিয়া কথিত। এই পর্ব্বত অতি উচ্চ। ইহার উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা যায় সেই দিকেই প্রকৃতির লীলা-নিকেতন দৃষ্ট হয়। প্রকৃতি-রাণী যেন হৃদয়ের সম্পূর্ণ গাম্ভীর্য্য দিয়া কাশ্মীরকে স্বহস্তে সাজাইয়াছেন। এখানে দাঁড়াইলে বোধ হয় গৃহের পর গৃহ, পল্লীর পর পল্লী, সমস্তই যেন কাশ্মীরী-সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-ডালি লইয়া পথিকের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। বস্তুতঃ কাশ্মীরকে বিধাতার বিলাস-কানন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কাশ্মীরে ছোট বড় অনেকগুলি হ্রদ আছে; তন্মধ্যে উলার-হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শ্রীনগরের ডাল-হ্রদও নিতান্ত ছোট নহে। কাশ্মীরের আপামর সাধারণ সকলে হ্রদে এবং ঝিলেম নদীতে নৌবিহার করিতে আনন্দ

লাভ করে এবং পর্ব্বতের নিম্নে নদীর ধারে অথবা বনের ভিতরে সকলে সমবেত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ ও বনভোজন করিতে বড় ভালবাসে।

হ্রদের মধ্যে ভাসমান উদ্যান কাশ্মীরের প্রধান দর্শনীয় বস্তু। মাদুরের উপর মৃত্তিকা বিস্তীর্ণ করিয়া এই উদ্যান রচিত। জলের নীচে খুঁটা পুতিয়া ইহা ভাসমান অবস্থায় বাঁধা আছে। ইহাতে লাউ, শশা প্রভৃতি নানা প্রকার ফল ও শাক-সব্জী জন্মে। মাঝে মাঝে এই উদ্যান চুরি হয়। চোরেরা খুঁটার বাঁধ কাটিয়া এই উদ্যান এক স্থান হইতে স্থানান্তরে টানিয়া লইয়া যায়।

বঙ্গদেশের ন্যায় কাশ্মীর ও পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানগণ স্বীয় স্বীয় জাতিগত পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলে। শিখেরা তাম্রকূট সেবন করে না কিন্তু মদ্য পান করিতে তাহাদের ধর্ম্মে নিষেধ নাই। হিন্দু-মুসলমান তাম্রকূট সেবন করে, কিন্তু মদ্য পান করিলে ধর্ম্মমতে পতিত হয়। বাঙ্গলার ন্যায় এখানেও হিন্দুরা মুসলমানের স্পৃষ্ট জল গ্রহণ করে না। সুখের বিষয়, এ সকল প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানেরা জাতিগত পার্থক্য রক্ষা করিলেও তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ নাই।

কাশ্মীরীগণ স্বধর্ম্মে এতদূর আস্থাবান যে এখানে

খ্রীষ্টান মিসনারীদের শত চেষ্টা সত্বেও ইংরাজ রাজত্বের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত মাত্র একটী ব্যক্তিকে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করাইতে পারিয়াছে। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অশিক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্ম বিশ্বাস অনেক অধিক।

জগতে যদি কোথাও স্বাস্থ্যকর স্থান থাকে, তাহা কাশ্মীর। "কাবাবের অর্দ্ধ-দগ্ধ-পক্ষী এখানে আসিলে তাহার পক্ষোদগম হয়।" এই প্রবাদ বাক্য কাশ্মীরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ঠ প্রমাণ। আমার এখানে এত ক্ষুধা বোধ হইত যে, বলিতে কি. জীবনে আর কখনও এমন ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে কিনা স্মরণ হয় না। এখানে নদীর জল ঝরণার জল, হ্রদের জল স্বচ্ছ, পবিত্র ও সুস্বাদু; কোন কোনটীতে স্নান করিলে কুষ্ঠ পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়। এ স্থানের বায়ু নির্ম্মল, শীতল ও স্বাস্থ্যকর। এই জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গদেশে নিদারুণ গ্রীষ্ম কিন্তু এখানে বাঙ্গলার শীত-ঋতুর ন্যায় শীত অনুভব হইল। এখানে গ্রীষ্ম ঋতু নাই; ষড়-ঋতুর মধ্যে শীত ও বসন্ত কেবল এই দুই ঋতু। কাশ্মীরে বসন্তকালেই যখন এই অবস্থা, পৌষ মাঘ মাসে যে কি ভয়ানক অবস্থা হয় তাহা কল্পনাতীত। জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা শীতাতিশয্যে পৌষ হইতে চৈত্র, এই চারি মাস

জম্মুতে বাস করেন। ঐ সময় মহারাজার দপ্তরখানা সহ অধিকাংশ কর্ম্মচারী জম্মুতে চলিয়া যান। যে সকল ভিন্ন দেশীয় কর্ম্মচারী এখানে থাকেন তাঁহারা অত্যন্ত গরম বস্ত্র ব্যবহার ও সর্ব্বদা অগ্নি-পাত্র সঙ্গে লইয়া অবস্থান করেন। শুধু কাশ্মীরীদের পক্ষেই এই ভয়ানক কাশ্মীরী শীত সহনীয়।

আশৈশব শুনিয়া আসিতেছি এবং পুস্তকেও পড়িয়াছি যে কাশ্মীরে চির-বসন্ত বিরাজিত। বর্ত্তমান সময়কে বড় জোর বসন্ত-ঋতু বলা যাইতে পারে, কিন্তু অগ্রহায়ণ পৌষ প্রভৃতি কতিপয় মাসের মহাশীতকে বসন্ত-কাল বলিব কোন্ বিধি অনুসারে? ভারতের প্রবল গ্রীষ্মে অস্থির হইয়া প্রায় ছয় শত ইংরেজ এই সময় কাশ্মীরের রমণীয় উপত্যকায় আশ্রয় লইয়াছেন, কিন্তু শীতকালে ভীষণ শীতের প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া ভ্রমণশীল পক্ষীর (Migratory bird) ন্যায় পুনরায় সকলেই স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। মোগল বাদসাহগণ কাশ্মীরে মহাগ্রীষ্ম অতিবাহিত করিতেন।

শীতপ্রধান দেশে অবস্থান হেতু কাশ্মীরী স্ত্রীলোকেরা বসন্তকালে সূর্য্যোত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। এই নিমিত্ত ইহারা রাত্রিশেষে উঠিয়া ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃতা

হয়। কাশ্মীরী পুরুষগণের আকৃতি পাঠানদের ন্যায় বলিষ্ঠ ও প্রতিভাব্যঞ্জক। ইহাদের বর্ণ গৌর ও মুখ ঈষৎ দীর্ঘাকৃতি। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি কাশ্মীরে এক ব্যক্তিকেও কৃষ্ণবর্ণ দেখি নাই। কাশ্মীরী স্ত্রীলোকেরা খর্ব্বাকৃতি ও বলিষ্ঠা। তাহারা অধিকাংশই পরমা সুন্দরী। তাহাদের মুখমণ্ডল আরক্তিম এবং অঙ্গ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ,—যেন স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডিত একখানি স্বর্ণ-প্রতিমা। তাহাদের কণ্ঠ-নিসৃত সঙ্গীত-লহরী পথিকের কর্ণে সুধা বর্ষণ করে। কাশ্মীরের মহিমাময়ী প্রাকৃতিক সুষমার ক্রোড়ে—অলিন্দে, রাজপথে, হ্রদ-সোপানে, সরসী-সলিলে ফুল্ল-পারিজাত-সদৃশ অতুল সৌন্দর্য্যময়ী কাশ্মীরী ললনাদিগকে নন্দন-কানন-বিহারী বিদ্যাধরী বলিয়া ভ্রম হয়।

কাশ্মীরের বর্ত্তমান রাজবংশের আদি-পুরুষ গোপাল-সিংহ। ইঁনি জম্মু-প্রদেশের রাজপুত রাজা রণজিৎ দেওএর ভ্রাতুষ্পৌত্র। সামান্য সৈনিকরূপে ইঁনি মহা-রাজা রণজিৎ সিংহের শিখ সেনাদলে প্রবেশ করিয়া ক্রমে সেনাপতি পদে উন্নীত হন এবং কালে সেই সেনাদলের সাহায্যে জম্মু অধিকার করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শিখ যুদ্ধের অবসানে ইঁনি ইংরাজের

নিকট হইতে জম্মু ও কাশ্মীরের কতকাংশ ক্রয় করেন এবং অবশেষে সার হেনরী লরেন্সের (Sir Henry Lawrence) সাহায্যে সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীর হস্তগত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্রমে রাজা রণবীর এবং তৎপুত্র প্রতাপসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁনিই বর্ত্তমান মহারাজা।

কাশ্মীরের আদালতে উর্দ্দু ভাষা প্রচলিত। এ স্থানের উর্দ্দু দণ্ডবিধি আইন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের (Indian-Penal-Code) অনুরূপ। এখানে গো-হত্যা করিলে পূর্ব্বে প্রাণদণ্ড হইত, এখন পাঁচ বৎসরের জেল হয়। ব্রাহ্মণ নর-হত্যা করিলেও তাহার জীবন-দণ্ড হয় না। ব্রাহ্মণের এতাদৃশ গৌরব রক্ষা করা শুধু ক্ষত্রিয় এবং রাজপুত জাতির মধ্যেই সম্ভবে। এখানে অস্ত্র-আইন নাই, সকলেই বন্দুক ব্যবহার করিতে পারে। মোটের উপর কাশ্মীর-রাজ্যে প্রজাগণ সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করে।

কাশ্মীর-রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীর এই দুইভাগে দুইটী গবর্ণরের অধীন বিভক্ত। প্রত্যেক গবর্ণরের বেতন মাসিক আটশত হইতে এক হাজার টাকা। এখানে একজন প্রধান মন্ত্রী, একজন প্রধান সেনাপতি এবং কয়েকজন সচিব আছেন যথা,—

১। প্রধান মন্ত্রী (Chief Minister)

২। প্রধান সেনাপতি (Commander-in-Chief)

৩। সচিবগণ (Ministers) :—

(ক) রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department)

(খ) পূর্ত্ত বিভাগ (Public-Works Department)

(গ) খাস বিভাগ (Home Department.)

(ঘ) বিচার বিভাগ (Judicial Department.)

বর্ত্তমান মহারাজার ভ্রাতা স্বর্গীয় অমরসিংহ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেওয়ান অমরনাথ সাহেব রায় বাহাদুর সম্প্রতি অস্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন। ইঁনি স্বর্গীয় অমরসিংহের ন্যায় কার্য্যদক্ষ নহেন। সম্ভবতঃ শীঘ্র ইঁহার স্থান অন্যে অধিকার করিবে। সচীবদের মধ্যে বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী (Judicial Minister) বাবু ঋষিবর মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালী। ইঁনি হাইকোর্টের জজ। ইঁহার বেতন মাসিক এক হাজার টাকা। অন্যান্য সামন্ত-রাজ্যের ন্যায় কাশ্মীরে ইংরাজ কর্ম্মচারী নাই। রাজ্য-সংরক্ষণের ভার প্রধানতঃ সচিবদের হস্তে ন্যস্ত।

এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সুখের বিষয়, এখানে যে কয়েকজন বাঙ্গালী আছেন, তাঁহারা সকলেই

পদস্থ হইয়া বাঙ্গালীর গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বৃদ্ধ মহেশচন্দ্র বিশ্বাস অভ্যর্থনা-কমিটির তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent of the Reception Department) ইঁহার বেতন মাসিক পাঁচশত টাকা। ডাক্তার আশুতোষ মিত্র কাশ্মীর ষ্টেট্ হাসপাতালের সিভিল-সার্জ্জন। এতদ্ভিন্ন স্থানীয় বাবু রমানাথ মিত্র, বাবু হরিপ্রসাদ মজুমদার এবং শ্রীহট্ট-নিবাসী বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দাসের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা আফিসে চাকরী করেন। এখানে ইঁহারা ব্যতিরেকে আর দুই চারিজন মাত্র বাঙ্গালী আছেন। সকলেরই বিশেষতঃ ঋষিবর বাবুর ব্যবহারে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এত বড় উচ্চ পদ পাইয়াও এই দূরদেশে ইঁনি সৌজন্য ও শিষ্টাচারে আপনাকে ও কাশ্মীরকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরব ও প্রশংসার বিষয় বটে। ইঁনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা!

কাশ্মীরাধিপতির ব্যাটবল খেলায় সাতিশয় অনুরাগ আছে। তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহই ক্লাবে খেলিতে দেখিয়াছি। একদিন ইংরেজের সহিত কাশ্মীরী ও পঞ্জাবীর ম্যাচ (match) হইল, তাহাতেও মহারাজা বেশ্ খেলিয়া-

ছেন। মহারাজা দুই চারিটী লোক সমভিব্যাহারে রাস্তায় পদব্রজে বেড়াইতে ভালবাসেন। রাজপ্রাসাদ হইতে ক্লাব এক মাইল ব্যবধান। তিনি প্রত্যহ এই পথ হাঁটিয়া আসেন। ভারতের একজন প্রধান সামন্ত রাজের এবম্বিধ জাকজমকহীণ ব্যবহারে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। অধিক কি, লালা মুলরাজ আমাকে রাস্তায় না দেখাইলে ইঁনিই যে জম্মু ও কাশ্মীরের অদ্বিতীয় অধীশ্বর তাহা আমি কখনই বুঝিতে পারিতাম না। মহারাজা অতিশয় দয়াবান্। প্রাণদণ্ডের অপ-রাধীকে তিনি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া অনেক সময় মুক্তি প্রদান করেন। বৎসরে দুই একটী লোকের প্রাণদণ্ড হয়; তাহাও প্রতি বৎসর নহে। মহারাজার সম্মান-সূচক তোপধ্বনির সংখ্যা উনিশটী। স্বর্গীয় অমর-সিংহের সময় নাকি পলিটিকেল রেসিডেণ্ট শ্রীনগরের বাহিরে অবস্থান- করিতেন, এখন শ্রীনগরেই বাস করেন।

রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে এখানে ক্রাউন প্রিন্স (Crown Prince) কহে। মহারাজার পুত্র না থাকায় স্বর্গীয় অমরসিংহের পুত্র (মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্র) ক্রাউন প্রিন্স হরিসিংহ এখন রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধি-

কারী। ইঁহার বয়ঃক্রম অনুমান ষোড়শ বর্ষ। ইঁহার বর্ণ গৌর এবং আকৃতি অতি সুন্দর। অন্যান্য সামন্ত-রাজকুমারের ন্যায় ইঁহাকে সৈন্য পরিবেষ্টিত অবস্থায় শকটে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়াছি।

আমার দাঁতের মাড়িতে একটী স্ফোটক (Gum-boil) হওয়ায় একদিন কাশ্মীর ষ্টেট-হাসপাতালে ঔষধ আনিতে গিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম—হাসপাতালের অধিকাংশ রোগী উপদংশগ্রস্ত। ইহা ভিন্ন কাশ্মীরে অন্য কোন ব্যাধি এক প্রকার নাই বলিলেও হয়। মাঝে মাঝে ওলাউঠার কিঞ্চিৎ প্রাদুর্ভাব হইতে শুনা যায়।

শ্রীনগরে চিত্রশালিকা (Museum), হাইকোর্ট, লাই-ব্রেরী, হাসপাতাল, ডাকঘর, আফিস, পণ্যশালা প্রভৃতি দেখিবার জিনিস। এখানে জলের কলনাই; ঝরণা হইতে পাইপ বসাইয়া জল আনা হইয়াছে।

শ্রীনগরের উপকণ্ঠে গোলাপ উদ্যান সমূহ একটী প্রধান দর্শনীয় বস্তু। নগরের নানাস্থানে এই উদ্যান দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক শাখায় শাখায় আট দশটী গোলাপ স্তবকে স্তবকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক একটী গোলাপ পদ্মের ন্যায় সুবৃহৎ। আমি এত বড় গোলাপ আর কোথাও

দেখি নাই। গোলাপ বৃক্ষের প্রত্যেক শাখার গোলাপগুচ্ছ এক একটী বৃহৎ ফুলের তোড়া! এই প্রকার শত শত গোলাপের তোড়া প্রত্যেক বাগানে ফুটিয়া রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিলে কাহার মন মুগ্ধ না হয়? আগন্তুকের পক্ষে কাশ্মীরে ইহা একটী অদৃষ্টপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য।

শ্রীনগরের কুকুর অত্যন্ত উগ্রস্বভাবাপন্ন। আমি এক দিবস আমাদের বাসার সমীপবর্ত্তী মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে একটী ক্ষুদ্র পল্লীর প্রান্তভাগে আসিয়াছি, এমন সময় সেই পল্লী হইতে সহসা দুইটী বৃহৎ কুকুর বহির্গত হইয়া আমাকে আক্রমণ করিল। আমার হস্তে যষ্টি থাকিলে বোধ হয় অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। তাহারা দীর্ঘ-দংষ্ট্রা বহির্গত করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করতঃ আমার অতি নিকটে আসিয়া পড়িল। আমি অনন্যোপায় হইয়া ক্ষেত্র হইতে অবিশ্রান্ত ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে আর অধিক অগ্রসর হইল না বটে কিন্তু নিরস্ত হইল না। অবশেষে আমি কুকুরের দিক সম্মুখ করিয়া ঢিল ছুড়িতে ছুড়িতে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলাম এবং ক্রমশঃ বাসার নিকট আসিয়া রক্ষা পাইলাম।

লক্ষ্ণৌ এবং অমৃতসরে আমি পুলিশের দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলাম, তাহা পাঠক বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই। সুদূর কাশ্মীরেও আমি পুলিশের তীব্র দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিলাম না। এখানে গোয়েন্দা বিভাগের (Criminal Investigation Department) লোক সর্ব্বদা আমার অনুসন্ধান লইয়াছে, এবং একদিন আমার ব্যাগ পর্য্যন্ত খানাতল্লাস (Search) করিয়াছে। এখানে আমার সকলেই অপরিচিত, এমতাবস্থায় কে ডিটেকৃটিভ তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। আমার উপর পুলিশ নিরর্থক এরূপ প্রখর দৃষ্টি রাখিতেছে কেন জিজ্ঞাসা করায় পঞ্জাবী বন্ধুগণ কহিলেন—"ইতিপূর্ব্বে কতিপয় বিপ্লবকারী যুবক কাশ্মীরে আগমন করিয়াছিল, এ জন্য ভ্রমণকারী বাঙ্গালীর উপর পুলিশের এত সন্দেহ।"

কাশ্মীরের নৈসর্গিক-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে দশ দিন দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল। সুখের দিন এইরূপেই মুহূর্ত্তে চলিয়া যায়! আমার এখানে কিছু দিন বাস করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ডিটেক্‌টিভের উপদ্রবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। তাহারা আমাকে দৈনিক তিন চারিবার দেখিয়া যাইত এবং আমার গতিবিধি সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিত। এই নিমিত্ত আর থাকিতে ভাল

বোধ হইল না। অপিচ, অকারণে আমার জিনিস খানাতল্লাস করায় আমি নিরতিশয় উত্যক্ত হইলাম এবং আর শ্রীনগর থাকিব না, মনস্থ করিলাম।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ প্রভাতে আমি প্রিয়তম কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া রাওলপিণ্ডি হইতে যে পথে আগমন করিয়াছি, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। হিমালয়-পথের বিবরণ এই দুর্ব্বল লেখনীর শক্ত্যনুসারে যথাসাধ্য লিপি-বদ্ধ করিয়াছি; অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই পথের দৃশ্যাবলী যদিও আমার নিকট এবার নূতন নহে, তথাপি সকলই যেন নূতন বোধ হইতেছিল, এবং আমি সেই পুরাতন-নূতন দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে লাগিলাম। এই দ্বিতীয়বার দর্শনেও তৃপ্তিবোধ হইল না; দেখিবার আকাঙ্খা যেন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—ইচ্ছা হইল, প্রত্যেকটী বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, নির্ঝর ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষু সার্থক করি। ইহাই শ্বেতশীর্ষ হিমালয়ের বিশেষত্ব।

আমি ৩১শে জ্যৈষ্ঠ রাওলপিণ্ডি পৌঁছিলাম। এখানে এক মাস বাস করিয়া পঞ্জাবীদের বিশেষ পরিচিত হই-লাম। সিন্ধুনদ (Indus) হিন্দুর একটী পবিত্র তীর্থ। রাওলপিণ্ডি পরিত্যাগ করিবার সময় সিন্ধু-স্নান কামনায়

উত্তর ভারত ভ্রমণ

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশের সংলগ্ন সিন্ধুনদ ও কাবুল নদীর সঙ্গমস্থলে, পঞ্জাবের অন্তর্গত আটক সহরে গিয়াছিলাম। আটক হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্রমশঃ পঞ্জাবের কাঙ্গরা জেলায় কাঙ্গরা ও জ্বালামুখী, এবং হোসিয়ারপুর জেলায় চিন্তাপূর্ণি প্রভৃতি পীঠস্থান ও অন্যান্য অনেক বন, পর্ব্বত, নগর ইত্যাদি সন্দর্শন করিয়া ছয় মাস পরে বঙ্গদেশে পৌঁছিয়াছি। স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া যে সকল স্থান দর্শন করিতে করিতে উত্তর-ভারতের পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশ যথাশক্তি বিবৃত করিয়াছি; কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনের সময় যে সকল নূতন স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছি, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে আর একখানা পুস্তক হইয়া পড়ে। অতএব এইখানেই এ পুস্তকের উপসংহার করা হইল।

আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত একদিন পুস্তকাকারে বহির্গত হইবে, ভ্রমণের সময় ইহা একবারও কল্পনাতে আসে নাই। তাহা হইলে অনেক জ্ঞাতব্য ও অত্যাবশ্যক বিষয় সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে পারিতাম, এবং তদ্বারা তাঁহাদের চিত্ত-রঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইতাম। আমার গভীর পরিতাপের বিষয় এই—আমি সেই মহামূল্য রত্নরাজি হেলায় পরিত্যাগ করিয়া

আসিয়াছি। এখন তাহা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া পাঠক-বর্গকে উপহার দেওয়ার আশা সুদূরপরাহত। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র পুস্তক সামান্য যাহা কিছু লিখিতে পারিয়াছি, তাহা পড়িয়া যদি অন্ততঃ একটী বঙ্গবাসীরও ভ্রমণ-স্পৃহা বলবতী হইয়া কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আমার সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

(সম্পূর্ণ)

সমুদ্র দর্শন।

আপনারা সকলেই বড় বড় নদী দেখিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় সমুদ্র অনেকে দেখেন নাই। তাই আজ আপনাদিগকে সমুদ্রের বিষয় কিছু বলিব। ইহা শুনিলে আপনারা সমুদ্রের কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন।

যে ব্যক্তি জীবনে কখনও সমুদ্র কিম্বা পর্ব্বত দেখে নাই, সে ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থের প্রকৃত মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারে নাই। সমুদ্র, পাহাড়, পর্ব্বত ও নানা দেশ

সমুদ্র দর্শন

পর্য্যটন করিয়া যেরূপ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা জন্মে এব
স্রষ্টার অনন্ত সৃষ্টি-কৌশল দেখিয়া মনে যেরূপ আনন্দ
ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়, তেমন আ
কিছুতেই হয় না। "আমরা বড় হইলে নানা দে
ভ্রমণ করিয়া নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করিব এব
সর্ব্বান্তঃকরণে পরমেশ্বরকে ভক্তি করিব," এ কথ
শৈশবে আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হয়, কিন্তু বিষ
প্রবেশ করিলে সংসারের দুর্দ্দমনীয় স্রোতে সে কল্পন
কোথায় ভাসিয়া যায়!

বঙ্গাব্দ ১৩০৮ সনে, চৈত্র মাসের প্রথম ভাগে চট্টগ্রা
অঞ্চলে ভ্রমণ, বিশেষতঃ বঙ্গোপসাগর দর্শন করিবা
ইচ্ছা আমাদের হৃদয়ে বলবতী হইল। কিন্তু অনেকে
বলিলেন, যে চৈত্র মাস হইতেই ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হয়
অতএব এ সময়ে সমুদ্রে যাওয়া অতিশয় আশঙ্কাজনক
আমরা ইহার প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার জন্য চ
গ্রামের জাহাজ কোম্পানির এজেন্টের নিকট ঐ মে
একখানি পত্র লিখিলাম। যথা সময়ে উত্তর আসিল,—
"এখন পর্য্যন্ত সমুদ্র-ভ্রমণে কোনরূপ আশঙ্কার কারণ নাই
ইহাতে আমাদের উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল, আম
বন্ধুত্রয় অবিলম্বে সমুদ্র দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম।

সমুদ্র দর্শন

২০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার আমরা চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম। কয়েক ষ্টেশন পরে রাস্তার দুই ধারে দুইটী প্রকাণ্ড সরোবর দেখিতে পাইলাম। এই দুইটী পূর্ব্বে যে একই সরোবর ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই রূপ বৃহৎ সরোবর আর কখনও দেখি নাই। ইহাতে অনেক রক্তোৎপল ফুটিয়া থাকাতে দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর দেখা যাইতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা অধিক-ক্ষণ ইহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি নাই, কারণ নিমিষের মধ্যেই ট্রেণ ইহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল। ইহা "কালীয়দমন হ্রদ" বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা ফেণী নদীর পুল পাইলাম। আসাম-বেঙ্গল-রেলওয়ে লাইনে এত বড় পুল আর নাই। এঞ্জিনখানা প্রায় ত্রিশ চল্লিশটী গাড়ী লইয়া চলিতেছিল। সম্পূর্ণ গাড়ীগুলি পুলের উপর ধরিয়াও আরও কিছু স্থান ছিল। পুলের দুই ধারে খুব বড় অক্ষরে লেখা আছে "Speed must not exceed more than five miles an hour."

ফেণী নদী সমুদ্রের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া ইহার জোয়ার ভাটা অত্যন্ত অধিক। যাইবার সময় ভাটা

ছিল; তখন দেখিলাম নদীর চিহ্নমাত্রও নাই। শুধু একটী ক্ষীণ রেখা সূত্রবৎ প্রবাহিত হইতেছে।

ফেণী নদী পার হইয়াই আমরা দুই ধারে সারি সারি পর্ব্বতমালা দেখিতে পাইলাম। আমাদের গাড়ী উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিতেছিল। পর্ব্বতগুলিও উত্তর দক্ষিণে লম্বমান রহিয়াছে; সুতরাং বোধ হইতে লাগিল যেন ইহারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। পর্ব্বতের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। ক্রমে আমাদের গাড়ী সীতাকুণ্ড ষ্টেশনে পৌঁছিল। সীতাকুণ্ড ষ্টেসন হইতে চন্দ্রনাথ এক মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু মনে হইল যেন আমরা গাড়ী হইতে ১০০ এক শত হাত হাঁটিয়া গেলেই পর্ব্বতের পাদদেশে পৌঁছিতে পারিব। এই পর্ব্বত এত উচ্চ যে গাড়ী হইতে চন্দ্রনাথের মন্দিরটীকে ক্ষুদ্র একটী শুভ্র রেখার মত দেখা যাইতেছিল, এবং তাহার নিকটবর্ত্তী বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষটীকে একটী অতি ক্ষুদ্র গুল্ম বলিয়া বোধ হইতেছিল।

আমরা সন্ধ্যার পর চট্টগ্রাম পৌঁছিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া শুনিলাম, প্রত্যেক শনিবার ও মঙ্গলবার তথা হইতে কক্স্‌বাজার জাহাজ যায়। অতএব আমাদিগকে বাধ্য হইয়া তথায় আরও এক দিন অপেক্ষা করিতে

হইল। আমরা আর কখনও চট্টগ্রাম সহর দেখি নাই। সেই দিন আমরা ভাল করিয়া সহরটী দেখিয়া লইলাম।

চট্টগ্রাম সহরের দৃশ্য অতি রমণীয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা লইয়া চট্টগ্রাম সহরটি গঠিত। স্কুল, কাছারী প্রভৃতি সমস্ত ছোট ছোট টিলার উপর নির্ম্মিত। মাদ্রাসা স্কুলের টিলাটি অত্যন্ত উচ্চ। ইহার উপরে উঠিলে বঙ্গোপসাগর স্পষ্ট দেখা যায়; এবং ইহার নীচের দিকে চাহিলে দালান, কোঠা, গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি ছোট ছোট খেলিবার সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। চট্টগ্রামের পাদদেশ প্রক্ষালিত করিয়া যে নদী প্রবাহিত হইয়াছে তাহার নাম কর্ণফুলি। কর্ণফুলির উভয় পারে সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণী বিরাজিত। এই নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বলিয়া সর্ব্বদাই ইহাতে জোয়ার ভাটা খেলিতেছে। এই নদীর গভীরতা অত্যন্ত অধিক। পারে অনেক বড় বড় ষ্টীমার ও জাহাজ নঙ্গর করিয়া আছে। ভাটার সময় জল অনেক নীচে নামিয়া যায়; তখন তীরস্থ বজরা ও অন্যান্য নৌকাগুলি ডাঙ্গায় পড়িয়া থাকে। জোয়ারের সময় তাহারা পুনরায় ভাসিয়া উঠে।

সমুদ্র দর্শন

চট্টগ্রামে এক প্রকার নূতন নৌকা দেখিলাম। ইহা বোধ হয় সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কারণ সমুদ্রে যাতায়াতের উপযোগী করিয়াই ইহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহাকে ইংরাজীতে "Burmese boat" এবং কথিত ভাষায় "সাম্পান" বলে। সম্পানের পশ্চাদ্ভাগে দুইটী করিয়া হাল থাকে এবং একটী মাত্র লোক দুইটী হাল বাহিয়া ইহাকে চালায়। সাম্পান লম্বায় পাঁচ, সাত হাত এবং পাশে দুই, তিন হাতের অধিক বড় হয় না। সাম্পান ব্রহ্ম-দেশীয় কাষ্ঠের দ্বারা প্রস্তুত হয়। এই কাঠ এত মজবুত যে লোণা জলে ইহা শীঘ্র নষ্ট করিতে পারে না। সাম্পানের বিশেষত্ব এই যে, যে কোন অবস্থায় পাল দিয়া ইহা সমুদ্রে যাতায়াত করিতে পারে। এই নৌকা কখনও ডুবে না।

সমুদ্রে যাইবার পূর্ব্বেই, সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহার নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিবার জন্য আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিল। আমরা তাহা দেখিবার জন্য বেলা দুইটার সময় সাম্পানে উঠিলাম। অন্যান্য নদীতে যেমন ইচ্ছামত স্রোতের বিপরীতে চলা যায়, কর্ণফুলিতে তাহা যায় না। এ নদী দিয়া যাইতে হইলে ভাটার

এই ফটোগ্রাফে তাহার হাস্যময়ী প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকি।" তিনি এই সকল কথা বলিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া আমরাও অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিলাম।

অপরাহ্লে আমরা সাহেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাদিগকে আরও কিছুকাল থাকিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমরা আর কাল-বিলম্ব করিতে পারিলাম না দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত আমাদিগকে বিদায় দিলেন। তৎপর আমরা গন্তব্য-স্থানে রওনা হইলাম।

আমরা অপরাহ্লে সমুদ্রের তীরে নামিলাম। সেখানে একটী উচ্চ টীলা এবং তদুপরি একটী বিশ্রাম-ঘর আছে। জাহাজাদির গমনাগমনের সুবিধার জন্য আমা-দের আকাশ-প্রদীপের ন্যায় তথায় খুব উচ্চ করিয়া একটী বাতি দেওয়া হইয়া থাকে। আমরা যখন সেখানে পৌঁছিলাম তখন সম্পূর্ণ ভাটা পড়িয়াছে। ভাটা পড়াতে সাগরের জল সৈকত হইতে প্রায় পোয়া মাইল নামিয়া গিয়াছে; ঐ স্থানটুকু হাঁটিয়া আসিতে আমা-দের পা কাঁদার ভিতর অনেকটা গাড়িয়া গেল। এই

সমুদ্র দর্শন

টীলার উপরে বসিয়া একটী একটী করিয়া সাগরের ঢেউ গণা যায়। স্থানীয় লোকে বলিয়া থাকে যে, আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস হইতে সমুদ্রের জল পাটীর মত সমান থাকে, তাহাতে একটী তরঙ্গও দেখা যায় না, কিন্তু আবার 'ফাল্গুনে আগুন' হয়; আমরা কার্য্যতাতেও তাহাই দেখিলাম। তরঙ্গের অবস্থা বড়ই প্রচণ্ড দেখা গেল, বোধ হইল সাগরাধিপতি একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছেন। ফেণী নদীর পার হইতে আমরা যে পাহাড় ক্রমাগত দেখিয়া আসিতেছি তাহা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া শেষ হইয়াছে।

আমরা যেখানে বসিয়া সমুদ্র দেখিতেছিলাম, সেখানকার দৃশ্য অতি সুন্দর। একদিকে অনন্ত সমুদ্র হুহুঙ্কারে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে, অন্য দিকে বহু যোজন-বিস্তৃত একটী বিশাল পর্ব্বত ঐরাবতের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া অটল অচলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সাগরের সহিত পর্ব্বতের ভীষণ সমর বাধিয়াছে। সাগরের এক একটী তরঙ্গ লোহার মুদ্গরের ন্যায় ধাক্কা মারিতেছে, কিন্তু পর্ব্বত সে প্রতিঘাত উপেক্ষা করিয়া নির্ভিক অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, সাহসিকতার পরিচয় দিতেছে, এবং মানবকে এই প্রকারে সমর-কৌশল শিক্ষা প্রদান

করিতেছে। সমরাঙ্গনে কেহই পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেছে না। আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া এই ইংরাজ-বুয়র সংগ্রাম দেখিলাম।

আমরা যে টীলার উপরে বসিয়াছিলাম সে টীলা হইতে পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য টীলাগুলির দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখা গেল। এখানকার প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়া। যে স্থানে সমুদ্র এবং পর্ব্বত একত্রে সমবেত হইয়াছে, সে স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। সে স্থানে বসিয়া ঈশ্বরের এই অপার মহিমা সন্দর্শন করিয়াও যাহার চিত্ত আকর্ষিত না হয়—যাহার হৃদয় ক্ষণেকের তরে ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত না হয়, তাহার জীবন অন্তঃসার-শূন্য। ঐ টীলার সন্নিকটে একটী পুষ্করিণী আছে; উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রবাদ আছে উহা চাঁদ সদাগরের পুষ্করিণী। সমুদ্র-গর্ভে অস্তগামী সূর্য্যের রমণীয় দৃশ্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় আমরা সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে সে সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়া উঠিল না। সন্ধ্যার সময় জোয়ার লাগিল, আমরা জোয়ার পাইয়া চট্টগ্রাম রওনা হইলাম। আসিবার সময় নৌকার মাঝি কর্ণফুলীর পারে একটী পাহাড় দেখাইয়া আমাদিগকে বলিল যে, ঐ পাহাড়ে অসংখ্য

সর্প বাস করে, এবং বিবিধ উদ্ভিজ্জ পাওয়া যায়। আমাদের ঐ পাহাড়ে উঠিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা সে বাসনা পরিত্যাগ করিলাম। জোয়ারের সাহায্যে আমরা শীঘ্রই চট্টগ্রামে পৌঁছিলাম।

২২শে শনিবার প্রাতে আমরা জাহাজ ঘাটে গেলাম। সে দিন বড়ই প্রচণ্ড বাতাস বহিতেছিল। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, কক্স্‌বাজার জাহাজে যাইতে হয়, কিন্তু জাহাজের পরিবর্ত্তে দেখিলাম—ছোট একখানা ষ্টীমার আমাদের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। ষ্টীমারখানি কলিকাতা গঙ্গার ঘাটের ফেরি ষ্টীমার অপেক্ষা কোনও অংশে বড় হইবে না। এ ষ্টীমারে উঠিয়া কিরূপে সাগরের ভিতর যাইব অগ্রে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী বন্ধুদ্বয় সমুদ্রের তরঙ্গ এবং দিনের অবস্থা খারাপ দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই যাওয়ার অমত প্রকাশ করিতেছিলেন, এক্ষণে ষ্টীমার দেখিয়া তাঁহারা এ বিষয়ে আরও দৃঢ় হইলেন। তাঁহাদের এরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া আমার একবার এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিলাম, তাহা দেখিয়া যাইব না,

হয়ত এ জীবনে আর কখন এ সুযোগ নাও হইতে পারে, এ জন্য চিরদিন একটা আক্ষেপ থাকিবে ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করিয়া এবং রাস্তায় ঝড় বৃষ্টি না হইলে ঈশ্বরেচ্ছায় বিশেষ কোনও আশঙ্কা নাই, ইহা কাপ্তানের নিকট শুনিয়া আমি একাকীই যাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাকে এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া আমার বন্ধুদ্বয় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু আমার উৎসুক-হৃদয় তাঁহাদের দুঃখ বুঝিল না। আমাকে বিপদে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাঁহারাই বা কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অতএব তাঁহা-রাও নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্বে আমার সহিত যাইতে বাধ্য হইলেন।

ষ্টীমার চট্টগ্রাম হইতে প্রথমতঃ কুতবদিয়া দ্বীপে, তৎপর মহেশখালী দ্বীপ হইয়া কক্স্‌বাজার যায়। কুতব-দিয়াতে আলোক্-স্তম্ভ (Light-house) আছে; মহেশখালী দ্বীপে সমুদ্র-গর্ভে গিরিরাজ মৈনাকের শিখর-দেশে "আদিনাথের" পবিত্র মন্দির অবস্থিত, এবং কক্স্‌-বাজার একটী মহকুমা। আমাদের এই তিনটী স্থানই দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এই সমস্ত স্থান দেখিতে অন্ততঃ এক সপ্তাহের দরকার। বিশেষ কার্য্যানুরোধে

আমাদের অতি সত্বর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিল; সুতরাং ইহার কোন একটী স্থান দেখিয়া পরদিনই ষ্টীমারে ফিরিয়া আসিবার প্রস্তাব করিলাম। আমাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখিবার তত ইচ্ছা ছিল না, সমুদ্র-ভ্রমণই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই তিনটীর যে কোন এক স্থানে যাইতে হইলেই সমুদ্রের ভিতর দিয়া যাইতে হয়; কারণ কর্ণফুলী নদী অতিক্রম করিলেই সমুদ্রে পড়িতে হয়। আমরা এখন কোন্ স্থানের টিকেট করিব, তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে একটু মতদ্বৈধ হইল; অবশেষে সকলেই স্থির করিলাম যে, চট্টগ্রামের পরবর্ত্তী ষ্টেসন কুতুবদিয়া যাওয়াই সঙ্গত; কারণ সেখানকার আলোকস্তম্ভ ভারত-বিখ্যাত এবং ইহা একটী দেখিবার জিনিস; অপিচ আমরা আর কখনও বৃহৎ দ্বীপ দেখি নাই, কুতবদিয়া গেলে সে বাসনাও পূর্ণ হইবে। এবম্বিধ আলোচনার পর আমরা কুতবদিয়ার টিকেট লইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম।

বেলা ৮ ঘটিকার সময় ষ্টীমার ছাড়িল। ষ্টীমার অত্যন্ত ছোট হইলেও যাহাতে দুই পার্শ্বের ঢেউ আরোহীর গাত্রে না লাগে, সেই জন্য অনেকখানি উচ্চ করিয়া

দুই দিকে লোহার পাত দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন্যান্য ফেরি ষ্টীমারের মত ইহা অল্প জলে চলে না, কারণ ইহা জলের উপরিভাগে যে পরিমাণ উচ্চ, জলের নিম্নেও আবার তেমনি গভীর। সেই জন্যই ইহা সহসা সমুদ্রে ডুবিয়া যায় না এবং সর্ব্বদা সমুদ্রে গমনাগমন করার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাকে সামুদ্রিক ষ্টীমার (Sea-going steamar) বলে। ষ্টীমারটী এত ছোট যে ইহাতে ৪০।৫০ জনের অধিক আরোহীর স্থান হয় না। আমরা ষ্টীমারে উঠিয়া দুইটী মাত্র ভদ্রলোক দেখিলাম, এতদ্ভিন্ন সমস্তই নিম্নশ্রেণীর লোক। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মগ। মগেরা কক্স্‌বাজার যাইতেছে। ২।১টী সন্ন্যাসী দেখা গেল, তাঁহারা মহেশ-খালী "আদিনাথ" দর্শনে যাইতেছেন। ভদ্রলোক দুইটীর মধ্যে একজন কক্স্‌বাজার খাসমহালের ডিপুটী, এবং অন্যজন তথাকার আসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন। ইঁহারা অত্যন্ত বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী। এখনকার বাবু-আখ্যাধারী মহোদয়গণ কোনও উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইয়া যেরূপ নব-জীবন প্রাপ্ত হন এবং সমাজে যেরূপ চরিত্রের আদর্শ স্থাপন করেন, ইঁহাদের মধ্যে তাহার কিছুই পরিলক্ষিত হইল না। ইঁহাদের আলাপ

ব্যবহারে আমরা বড়ই পরিতুষ্ট হইলাম। সমস্ত রাস্তাই ইঁহাদের সহিত নানা বিষয়ের কথোপকথন হইতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে দিন প্রচণ্ড বাতাস বহিতে-ছিল, কর্ণফুলী নদীতেই বেশ একটু একটু ঢেউ খেলিতে লাগিল। ঢেউ দেখিয়া কাপ্তান বলিলেন যে আজিকার অবস্থা বড় ভাল দেখা যায় না। দেখিতে দেখিতে ষ্টীমার সমুদ্রের তীরবর্ত্তী সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া একেবারে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় আসিয়া পড়িল। সাগরের মুখেই একখানা জাহাজ মারা গিয়াছিল, সেখানে ভবিষ্যতে অন্য কোন জাহাজের ধাক্কা না লাগে এবং নাবিকেরা যাহাতে দূর হইতে উহা দেখিতে পায়, সেই জন্য ঐ জলমগ্ন পোতের উপর চিহ্নস্বরূপ দুইটী লৌহ-স্তম্ভ স্থাপিত করা হইয়াছে। ষ্টীমার সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াই তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে লাগিল; বোধ হইল যেন এক একবার আমরা পাহাড়ে উঠিতেছি এবং পরক্ষণেই আমরা নীচে পড়িয়া যাইতেছি। আমরা দাঁড়াইয়া দুরন্ত সমুদ্রের রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম। আমরা যে দিকে চাহিলাম সেই দিকেই দেখিলাম যে তরঙ্গ-বিক্ষোভিত অনন্ত-প্রসারিত নীল জলরাশি কেবল ধূ ধূ

করিতেছে এবং বোধ হইতে লাগিল যেন পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউগুলি চতুর্দ্দিক হইতে মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগের ষ্টীমারখানাকে একেবারে গ্রাস করিতে চাহিতেছে; ষ্টীমারখানি একবার এ পার্শ্বে, একবার ওপার্শ্বে আন্দোলিত হইয়া অতি কষ্টে মৃদু-মন্দগতিতে গন্তব্য-পথে চলিতেছে। এ দৃশ্য জীবনে অন্ততঃ একবার দেখা উচিত। তুমুল তুফানে বঙ্গোপসাগর যে অতুলনীয় বেশ ধারণ করে, তাহা বেশ বুঝিলাম। বৃহৎ জলাশয়ে পিপীলিকাগুলি যেমন একটী বট পত্রে ভাসিতে থাকে, আমরা কয়েকটী লোক এ অনন্ত-সমুদ্রে তেমনি ভাসিতে লাগিলাম। এখানে আজ আমাদের ক্ষুদ্রত্ব স্পষ্ট অনুমিত হইল; মান, সম্ভ্রম, অহঙ্কার, অভিমান, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা সকলই আজ এখানে চূর্ণীকৃত হইল। একবার ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিলাম, নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। ষ্টীমার চলিল—একে প্রতিকূল বায়ু, তাহাতে আবার জোয়ার লাগিয়াছে, সুতরাং উভয়েই আমাদের প্রতিকূল। এই প্রতিকূল জল-বায়ুর বিপরীতে আমাদের ষ্টীমার চলিল। ক্রমেই বেলা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাতাস আরও অধিকতর প্রবলবেগে বহিতে লাগিল।

কাপ্তান বলিলেন যে, সঙ্গু-নদীর মুখ পর্য্যন্ত আমরা যাইবই; পরে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা বোধ হইলে সেখান হইতে ফিরিব। কাপ্তান আরও বলিলেন যে, গত বৎসর বৈশাখ মাসের এক দিবস ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দিন ছিল, ঐ দিন ষ্টীমারের উপর হাঁটু পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছিল তথাপি আমরা ফিরিয়া আসি নাই। বিশেষ কারণ ব্যতীত ষ্টীমার ফিরাইলে কোম্পানীর সাহেবের নিগ্রহের ভাজন হইতে হয়, এবং এ জন্য আমাদিগকে অনর্থক অর্থ দণ্ড দিতে হয়। ষ্টীমার সমুদ্রে প্রবেশ করা অবধিই ক্রমাগত দুই পার্শ্বে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছিল; তাহাতে অধিকাংশ লোকের বমন হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের তাহা হইল না, কারণ আমরা প্রাতে ষ্টীমারে উঠিবার সময় কিছুই আহার করিয়া উঠি নাই। আমাদের বমন না হইলেও অস্থিরতা ও মস্তক-ঘুর্ণন প্রভৃতি সমুদ্র-পীড়ায় (Sea-sickness) আমরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম; এমন কি আমাদের দাঁড়াইবার এবং কথা বলিবারও শক্তি রহিল না; আমরা তিনজনই ষ্টীমারে বসিয়া পড়িলাম।

ক্রমে আমাদের ষ্টীমার সঙ্গুর মুখে আসিল। এখানে সঙ্গুর একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। সঙ্গু নামে একটী

পার্ব্বতীয় বেগবতী নদী চট্টগ্রামের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। যে স্থানে ইহা সাগরের সঙ্গে মিশিয়াছে, আমাদের কতকটা জায়গা তাহার নিকট দিয়া যাইতে হয়। এখানকার তরঙ্গ অত্যন্ত ভীষণ, দেখিলেই প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। যে ঢেউ কখনও কল্পনায় আসে নাই, আমরা স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলাম। এক একটী ঢেউ একতল গৃহের সমান উচ্চ হইবে এবং গভীরতাতেও ইহা অপেক্ষা কম নহে; ষ্টীমার তরঙ্গের সহিত প্রতি মুহূর্ত্তে এই পরিমাণ উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল এবং অধঃ-পতিত হইতে লাগিল। এক একটী ঢেউ পাশেও কম নহে; আমাদের ষ্টীমারের মত দুই তিনখানা ষ্টীমার একটী তরঙ্গের উপর বেশ ধরে। সঙ্খু নদীর মুখের সন্নিকটে আসিয়া ষ্টীমার জল এবং বায়ুর প্রতিকূলে এক হাতও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; এ দিকে ষ্টীমারের ভিতর তরঙ্গে তরঙ্গে হাঁটু সমান জল উঠিয়া চারি-দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে।

সহসা যদি আমাদের কাহারও কোন পীড়া উপস্থিত হয়, তৎপ্রতিকারার্থে কয়েকটী ঔষধ আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহার কিয়দংশ তরঙ্গাঘাতে নষ্ট হইয়া গেল, আমাদের

কাপড় ভিজিয়া গেল এবং অন্যান্য দুই একটী দ্রব্যও ক্রীড়াশীল উর্ম্মির সহিত সদর্পে নৃত্য করিতে করিতে অনন্তে মিশিয়া গেল। দেখিলাম, প্রত্যেক তরঙ্গাঘাতেই ষ্টীমার মারা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার কল, কৌশল এবং গঠনপ্রণালী এমনই সুন্দর যে প্রত্যেকটী তরঙ্গের জলরাশি ষ্টীমারে আসিয়া তৎক্ষণাৎ এমন ভাবে গড়াইয়া যায় যেন দেখিয়া বোধ হয় ষ্টীমারে এক ফোঁটাও জল নাই। একটী তরঙ্গের জলরাশি ষ্টীমারে থাকিতে থাকিতে যদি ইহা দ্বিতীয় তরঙ্গের জলসমূহ প্লাবিত হয়, তবেই ষ্টীমার ডুবিয়া যায়, কিন্তু তাহা হয় না। যখন তরঙ্গের সহিত ষ্টীমার উর্দ্ধে উঠে, তখন চাকা জল স্পর্শ করিতে না পারায় ষ্টীমারের গতি বন্ধ হয় এবং পরমুহূর্ত্তেই খাদে পড়িয়া ষ্টীমারের কাজ চলিতে থাকে, পুনরায় উর্দ্ধে উঠিয়া গতি বন্ধ হয় এবং পরক্ষণেই আবার চলিতে আরম্ভ করে, এ প্রকার সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ষ্টীমার চলিতে লাগিল। তরঙ্গের কৃপায় যাহা ঘটে ঘটুক, আমরা নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।

জল এবং বায়ুর প্রতিকূল শক্তিতে বেগে চলিতে চেষ্টা করাতে ষ্টীমারের অগ্রভাগে ভীষণ তরঙ্গ সম্মুখিত

হইল এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ডেকের উপর বেগে জল আসিয়া একেবারে স্রোত চলিতে লাগিল। ক্রমে বিষম ব্যাপার আরম্ভ হইল, ভাবিলাম, এ আবার কি ব্যাপার! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবেই হইবে, আমাদের ভাবনা বৃথা। এই সময় আমার হৃদয়ে একটী অনুতাপের উদয় হইল। অনুতাপ—ঈশ্বর না করুন, যদি কোনও বিপদ ঘটে, তবে, আমার জন্যই বন্ধুদ্বয়ের প্রাণ-বিয়োগ হইবে—এ যাতনা আমার নিকট মৃত্যু-যাতনা অপেক্ষাও ভীষণতর বোধ হইল এবং স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নিজকে শতবার ধিক্কার দিতে লাগিলাম এবং মনে মনে ভাবিলাম—"এ স্থানে মৃত্যুই আমার উপযুক্ত শাস্তি।" আমি ভয়ার্ত্ত-চিত্তে, কাতর-স্বরে, ব্যাকুলভাবে পরমেশ্বরের নিকট বন্ধুদ্বয়ের জীবন ভিক্ষা করিলাম। আমার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল, উদ্বেলিত হৃদয় শান্ত হইল এবং মন প্রফুল্ল হইল। বুঝিলাম, আমার করুণ-প্রার্থনা হয়ত তাঁহার সমক্ষে পৌঁছিয়াছে তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না।

এ দিকে তরঙ্গের অবস্থা দেখিয়া কাপ্তান ষ্টীমার থামাইয়া দিলেন; তাহাতে সম্মুখের তরঙ্গ একটু থামিল এবং ষ্টীমারে জলও কম উঠিতে লাগিল, কিন্তু পার্শ্বদেশ

হইতে ঢেউগুলি অনবরত লোহার মুদ্গরের ন্যায় ধাক্কা মারিতে লাগিল এবং ষ্টীমারখানা উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ ভাবে আর কত-ক্ষণ থাকা যায়! বিশেষতঃ প্রতি মুহূর্ত্তেই ষ্টীমার মারা যাওয়ার আশঙ্কা, ইহা বিবেচনা করিয়া কাপ্তান ষ্টীমার ফিরাইতে চাহিলেন এবং এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ডেপুটী বাবুর মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। আসন্ন বিপদ উপস্থিত না হইলে ষ্টীমারের অধ্যক্ষ যে সহজে ষ্টীমার ফিরাইতে ইচ্ছা করেন না ইহা তিনি বুঝিলেন না। তিনি সদর্পে বলিলেন,—"আমি আপনাকে ফিরাইতে বলিয়া কোম্পা-নীর সাহেবকে Black face (এ পোড়ামুখ) দেখাইতে পারিব না; কারণ, তিনি হয়ত ভাবিবেন যে আমরা ভীরু বাঙ্গালী, তাই প্রাণের ভয়ে ফিরিয়া আসি-য়াছি। ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। এই কয় মাস সমুদ্রে এ রকম Bad weather (খারাপ আব হাওয়া) সর্ব্বদাই থাকিবে, অথচ, কল্যই যখন আমার পুনরায় কক্স্‌বাজার আসিতে হইবে, তখন এত দূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া যাইতে আমি কখনই মত দিতে পারি না। আপনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া

কক্স্‌বাজার অভিমুখে ষ্টীমার ছাড়িয়া দেন, অথবা আপনি যদি একান্তই ফিরাইবার আবশ্যক বোধ করেন তবে নিজের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাখিয়া ফিরাইতে পারেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করিলে আমি কখনই আপনার মতের পোষকতা সম্পাদন করিব না।"

বিপদ্‌ সময়েও তাঁহার এরূপ তেজঃপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা চমৎকৃত হইলাম। কাপ্তান নিজে বলিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না, এজন্য তিনি বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং পূর্ণবেগে ষ্টীমার চালাইতে লাগিলেন। ষ্টীমার ফিরিল না দেখিয়া আমরা প্রথমতঃ ডেপুটী বাবুর উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলাম, শুধু তাঁহার জন্যই আমাদের কুতবদিয়া দেখা হইয়াছে, কারণ ষ্টীমার ফিরিলে সময় অভাবে আর আমাদের যাওয়া হইত না।

অনেক দূর হইতে কুতবদিয়ার আলোক-স্তম্ভের চূড়া দেখা যাইয়া থাকে। ষ্টীমারের কর্ম্মচারিগণ সকলেই পুনঃপুনঃ সেই দিকে চাহিতে লাগিল এবং অনেকক্ষণ পর চূড়া দেখা গেল। ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই আনন্দিত হইলাম এবং বুঝিলাম তীরে পৌঁছিতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

সমুদ্রের ভিতর মাঝে মাঝে অনেক বংশদণ্ড দেখিতে পাইলাম। জলের গতি যে সময় যে দিকে থাকে বংশদণ্ডগুলির অগ্রভাগ সেই সময় ঠিক সেই দিকে, হেলিয়া পড়ে, এবং জোয়ার ভাটার সন্ধি-সময়ে মাথাগুলি ঠিক খাড়া হয়। ইহাতে জেয়ার ভাটা স্পষ্ট নিরূপণ করা যায়। পাঠক, একবার চাহিয়া দেখুন—এই অনন্ত বিস্ফারিত জলরাশির মধ্যে কয়েকখানি বংশদণ্ড নীরবে অবনত-মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া কি প্রকার সুকৌশলে পান্থকে পথ বিবরণ বিজ্ঞাপিত করিতেছে!

আমরা রাস্তায় বড় বড় ষ্টীমার এবং জাহাজ দেখিতে পাইলাম। আমাদের এ "লাইনে" পূর্ব্বে একখানা বড় ষ্টীমার ছিল, কিন্তু তাহা মন্দগতিতে চলিত, সেই জন্য এই ছোট ষ্টীমারখানা দেওয়া হইয়াছে; ইহা অত্যন্ত দ্রুত চলে। শুনিলাম শীঘ্রই একখানা দ্রুতগামী বড় ষ্টীমার ইহার স্থান অধিকার করিবে। সঙ্গু নদীর মুখে সাগরের নীল জল এবং নদীর জল বেশ পৃথক করা গেল। ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা সমুদ্রে থাকিয়া বেলা দুই কি আড়াই ঘটিকার সময় আমরা কুতবদিয়া উপনীত হইলাম। তথায় উপনীত হইয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত উক্ত ডেপুটী বাবু এবং ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে

বিদায়গ্রহণ করিলাম। ডেপুটী বাবু আমাদিগকে কক্স্-বাজার যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তথায় যাওয়ার সঙ্কল্প আমরা পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছি, অতএব সেখানে আর যাওয়া হইল না।

ষ্টীমার তীর হইতে দূরে থাকে। ষ্টীমার থামিবা মাত্র তীর হইতে দুইটী মুসলমান মাঝি একখানা ছোট জেলে-ডিঙ্গী লইয়া ষ্টীমারের ধারে আসিল। ডিঙ্গীখানা পাশে দুই হাত এবং লম্বাতে পাঁচ হাতের অধিক হইবে না। আমরা ৪।৫টী লোক নৌকায় নামিলাম। আমাদের সঙ্গে কোনও ভারী জিনিস ছিল না, কিন্তু অন্যান্য লোকের সঙ্গে কয়েকটা বোঝা এই ক্ষুদ্র নৌকায় উঠান হইল। নৌকাখানা বেশী বোঝাই হওয়াতে দাবিয়া প্রায় জলের সমান হইল। এদিকে বাতাসও খুব প্রবল-বেগে বহিতেছিল; তরঙ্গের আঘাত লাগিয়া নৌকার দুই পার্শ্ব দিয়া জল উঠিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মাঝিরা খুব তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিতে লাগিল; অৰ্দ্ধ পথে আসিবার পর হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, নৌকার ভিতরের দুইটী বৃহৎ ছিদ্র দিয়া তীরবেগে জল উঠিতেছে এবং নৌকার কিয়দংশ জলমগ্ন হইয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! ভাবিলাম, এবার আর বন্ধুদ্বয়কে রক্ষা করিতে পারি-

লাম না। মাঝিরা উচ্চৈঃস্বরে “দোহাই আল্লা, দোহাই খোদা” বলিতে বলিতে একজন জল-সেচন করিতে লাগিল, এবং অন্য জন প্রাণপণে বাহিতে লাগিল। আমরা ছিদ্র দুইটী বন্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। অবশেষে নিরুপায় ভাবিয়া ষ্টীমারের জালিবোট ছাড়িয়া দিবার জন্য তত্রত্য লোকদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম, এবং হস্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করিলাম। আমাদের বিপদ্ বুঝিয়া ষ্টীমার হইতে তাড়াতাড়ি জালিবোট ছাড়িবার উদ্যোগ করিল, কিন্তু জালিবোট ষ্টীমারের উপর বাঁধা ছিল, সেখান হইতে নামাইয়া জলে ভাসাইতে কিছু সময় লাগিল। এই সময়ের মধ্যে আমরা ষ্টীমার হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের নৌকা প্রায় ডুবু ডুবু হইয়াছে। জালিবোট আমাদিগকে ধরিতে ধরিতে নৌকা একেবারে ডুবিয়া যাইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু বন্ধুদ্বয়কে এখন কি প্রকারে বাঁচাইব আমি তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ঈশ্বরানুগ্রহে তখন ভাটা পড়িয়াছিল, এবং আমাদের নৌকাও তীর হইতে মাত্র ২৫।৩০ হাত দূরে ছিল; নৌকা হয়ত

অল্প জলে আসিয়াছে ইহা অনুমান করিয়া একটী মাঝি লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নামিয়া তাহার গলা জলে দাঁড়াইয়া আশ্রয় পাইল। সে কিছু দূর টানিয়া আনিতে আনিতে নৌকা ডুবিয়া গেল; আমরা বুক-জলে নামিয়া রক্ষা পাইলাম। আমাদিগকে তীরে উঠিতে দেখিয়া জালি-বোট ফিরিয়া গেল, এবং ষ্টীমার মহেশখালি অভিমুখে যাত্রা করিল।

কক্স্‌বাজারের মত কুতবদিয়াও একটী খাসমহাল। কুতবদিয়ার কাননগু মহাশয় ঐ স্থানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে উক্ত ডেপুটী বাবুই কক্স্‌বাজার, মহেশখালি, কুতবদিয়া এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য সমস্ত খাসমহালের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী। আমাদের সঙ্গে ডেপুটী বাবুর একটী পিয়ন ছিল। কাননগু মহাশয় যাহাতে আমাদের সকল বিষয়ের সুবিধা করিয়া দেন, তজ্জন্য ডেপুটী বাবু পিয়নকে পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট বলিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আমরা পিয়নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই অপরিজ্ঞাত দ্বীপের মধ্যে চলিলাম। দ্বীপটী যে বহু পুরাতন তত্রত্য গগনস্পর্শী বৃক্ষগুলিই তাহার পরিচায়ক। দ্বীপটী উত্তর দক্ষিণে লম্বা; ইহা দৈর্ঘ্যে কুড়ি মাইল এবং প্রস্থে দুই মাইল। আমরা

পূর্ব্বতীরে অবতরণ করিয়াছিলাম, পিয়নের সঙ্গে একেবারে পশ্চিম-তীরে আসিয়া উপনীত হইলাম, কারণ পশ্চিম-তীরেই খাসমহালের কাছারী এবং কানন্গু মহাশয়ের বাসা। এখানে মাত্র একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় ও থানা আছে এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই দ্বীপে সর্ব্বসমেত মাত্র চারি পাঁচটী ভদ্রলোক কর্ম্মচারী আছেন, এতদ্ভিন্ন স্থানীয় বাসিন্দা ভদ্রলোক এখানে একটীও নাই। চতুর্দ্দিকে সাগর-পরিবেষ্টিত এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দ্বীপটীর মধ্যে এই কয়জন ভদ্রলোক সম্পদে, বিপদে, সুখে দুঃখে একত্রে অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা একে অন্যকে সহায়তা করিতেছেন। ইঁহারাই ইঁহাদের সমাজ, এবং এই ক্ষুদ্র সমাজ লইয়াই ভারতের একটী নির্জ্জন দ্বীপে ইঁহাদের প্রাত্যহিক জীবন ব্যয়িত হইতেছে। প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেই চির-পরিচিত কয়টী লোকের মুখ-দর্শন করাই যাঁহাদের চিরাভ্যাস, তাঁহারা যে আমাদিগকে হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে দেখিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? তাঁহাদের সৌজন্য এবং শিষ্টাচারে আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। আমরা এ দুর্দ্দিনে কোনও বিশেষ কারণ ব্যতীত শুধু আলোক-স্তম্ভ দর্শনেচ্ছু হইয়া এই বিপদ-সঙ্কুল ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি

ইহা তাঁহাদের কিছুতেই প্রত্যয় হইল না। আমরা অনেক চেষ্টার পর তাঁহাদিগকে এই বিশ্বাস জন্মাইলাম। আমরা পূজার পর বহির্গত না হইয়া কেন এ অসময়ে সমুদ্রের ভিতর প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছি এজন্য তাঁহারা আমাদিগকে অনেক অনুযোগ করিলেন, এবং যাহাতে ভবিষ্যতে আমরা এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ হিতোপদেশ দিয়া বলিলেন যে, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তাঁহারাও কখন এ সময়ে সমুদ্রে যাতায়াত করেন না, বরং এ জন্য সময় সময় তাঁহারা চাকুরি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তথাপি এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা বলিলেন যে, বড় ষ্টীমার অথবা জাহাজে সমুদ্রে যাতায়াত করা অসঙ্গত নয়, কিন্তু এ দিনে এত ছোট ষ্টীমারে সমুদ্র-ভ্রমণ নিতান্ত অন্যায়। আমি এরূপ অবস্থায় আসিয়া যে নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য করিয়াছি এবং শুধু আমার জন্যই যে বন্ধুদ্বয় এরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন ইহা স্মরণ করিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। আমি গোপনে অশ্রু-সম্বরণ করিলাম এবং যাহাতে তাঁহারা নিরাপদে স্বদেশে পৌঁছিতে পারেন, ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে তাহা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

কাননগু মহাশয়ের বাসাতে আমাদিগের থাকার বন্দোবস্ত হইল। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্নে আলোক-স্তম্ভ দর্শনার্থ চলিলাম। আলোক-স্তম্ভ আমাদের বাসা হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে। সমুদ্রের পার দিয়া ঠিক উত্তরমুখে একটী রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তায় আলোক-স্তম্ভে পোঁছিতে হয়। আমরা রাস্তা দিয়া না যাইয়া একেবারে সমুদ্র-তট দিয়া চলিলাম। সমস্ত বেলাভূমির উপর লবণের সর পড়িয়া থাকাতে তাহা বড়ই সুন্দর দেখা যাইতেছিল। সেই লবণ-সংযুক্ত বেলা-ভূমির উপর আমরা স্থানে স্থানে নানা প্রকার পদার্থ এবং বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জন্তুর কঙ্কাল দেখিতে পাইলাম। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল। সমস্ত দিবস মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে আমরা সমুদ্র-গর্ভে সূর্য্যাস্ত দেখিতে পারিলাম না। সন্ধ্যার সময় আমরা আলোক-স্তম্ভের নিকট পোঁছিলাম। আলোক-স্তম্ভ সমুদ্রের পারে অবস্থিত। ইহা অতি উচ্চ একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত সপ্ততল-গৃহ এবং দূর হইতে দেখিতে কোনও দেবালয় বা মনুমেণ্টের মত দেখা যায়। আমরা ইহার উপরে উঠিয়া দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া তথাকার উর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীকে জানাইলাম; তিনি আমা-

দিগকে পর দিবস প্রভাতে আসিয়া দেখিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু পর দিবস সময় অভাবে তাহা আমাদের দেখা হইল না। সন্ধ্যার সময় আলোক-স্তম্ভের সর্ব্বোপরি প্রকোষ্ঠে বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হইল। আলোকের রশ্মিতে সমুদ্র, মাঠ, বন প্রভৃতি অনেক দূর ব্যাপিয়া আলোকিত হইল। শুনিলাম, বঙ্গোপসাগরের যে কোনও স্থান হইতে নাবিকেরা এই আলোক দেখিতে পায়। এতাদৃশ বৃহৎ আলোক-স্তম্ভ ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে আমরা ঐ আলোকের সাহায্যে বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আসিবার সময় দেখিলাম সমুদ্রে জোয়ার লাগিয়াছে। সাগরের কি অমানুষী শক্তি! সমুদ্র এককালে উথলিয়া উঠিয়াছে; এবং জোয়ারের জল দশ বার হাত উচ্চ হইয়া হুহুঙ্কার পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া এক একবার বেলা-ভূমি প্লাবিত করিতেছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এ দৃশ্য দেখিলে কাহার শরীর রোমাঞ্চিত না হয়? বোধ হইল যে সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই দ্বীপবাসীদের কোন গুরুতর পাপের দণ্ড-বিধান করিবার জন্যই যেন ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিয়া এই ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র দ্বীপখানি একেবারে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

জলের সেরূপ গভীর গর্জ্জন জীবনে আর কখনও শুনি নাই ; আমাদের নিকট উহা শত সহস্র মেঘ গর্জ্জনবৎ বোধ হইতে লাগিল। জলের আধিক্য হেতু এবার আমরা সমুদ্র-তট দিয়া না আসিয়া রাস্তা দিয়া বাসায় ফিরিলাম। যদিও রজনী নিবিড় তমসাচ্ছন্ন ছিল তথাপি আমরা অনেক দূর পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক আলোকের সাহায্য পাইয়াছিলাম ; অতএব আমাদের বাসায় ফিরিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই, তবে এই অপরিজ্ঞাত প্রদেশে আমরা তিনটী বন্ধু সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন শুনিতে শুনিতে রজনীর অন্ধকারে অনেক বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আসিতে মাঝে মাঝে একটু শঙ্কা বোধ করিতেছিলাম। আমরা রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। দিবসের অনশন এবং পরিশ্রমে আমাদের শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হইয়াছিল, আমরা শীঘ্র আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিলাম।

আমাদের বাসা হইতে সমুদ্র বোধ হয় সার্দ্ধশত হস্ত পরিমাণের অধিক হইবে না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ইহার তীর নদীর মত ভাঙ্গে না, এবং জোয়ারের জল যে পর্য্যন্ত আসার নিয়ম তাহার অধিক

কখনও আসে না। বর্ষার সময়েও সমুদ্রের জল বাড়ে না, কারণ অনন্ত সাগরের মধ্যে বর্ষার জল আসিয়া কত বাড়িবে? মহতের মহৎ গুণ। সমুদ্রের তরঙ্গে একটীও আবর্ত্ত নাই। যদি সমুদ্রে আবর্ত্ত থাকিত তবে বড় বড় জাহাজ সেই আবর্ত্তে পড়িয়া মারা যাইত।

এই বিশাল সাগরের মধ্যে পড়িয়াও যদি কিছু ধরিয়া থাকিবার আশ্রয় পাওয়া যায় তাহা হইলে বাঁচিবার আশা থাকে। স্থানীয় লোক-প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, একবার কয়েকটী লোক একটী নৌকায় বাঁশ বোঝাই করিয়া সমুদ্র-সৈকতে নোঙ্গর করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিল; গভীর নিশীথ সময়ে হঠাৎ জোয়ার আসিয়া তাহাদের নৌকা ভাসাইয়া নেয়, এবং নৌকাখানা ডুবিয়া যায়। নৌকার অধিকাংশ লোকই মারা গিয়াছিল, মাত্র দুইটী লোক বাঁশের বোঝা ধরিয়া ভাসিতে লাগিল। ভাঁটার সময় তাহারা দশ বার মাইল ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল পুনরায় জোয়ার লাগিলে জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা একেবারে তীরে আসিয়া জীবন-রক্ষা করিল। মাঝে মাঝে এ রকম অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছে শুনিতে পাওয়া গেল। নদীতে যেরূপ মৎস্য থাকে এখানেও সেইরূপ অসংখ্য মৎস্য বিচরণ করে।

সমুদ্র দর্শন

এই দ্বীপ সমুদ্রের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত এবং ইহার বিপরীত দিকে মেদিনীপুর, অর্থাৎ এখান হইতে জাহাজে উঠিয়া ঠিক পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলে মেদিনীপুর না পৌঁছা পর্য্যন্ত অন্য কোনও স্থলভাগ দৃষ্ট হইবে না। এ দ্বীপের পূর্ব্বদিকে কোন্ প্রদেশ তাহা আমাদের জানা নাই, সম্ভবতঃ ইহা চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত কোনও স্থান হইবে। দ্বীপের আয়তন অনুসারে লোক সংখ্যা নিতান্ত কম। এ স্থানের জল বায়ু মন্দ নহে। সাগরের জল লোণা বলিয়া পুকুরের জল ব্যবহৃত হয়। পুকুরের জল বেশ পরিষ্কার। এখানে সপ্তাহে একদিন হাট ও এক দিন বাজার হয়। হাট, বাজারে সময়োচিত ফল এবং তরকারী বেশ পাওয়া যায়। হাটে দুগ্ধ কিনিতে পাওয়া যায় না। যাহাদের গাভী আছে শুধু তাহারা ভিন্ন অন্যে দুগ্ধ খাইতে পায় না। এখানে বড় মৎস্য একেবারেই পাওয়া যায় না। ছোট মৎস্য যে কয়েক প্রকারের দেখিলাম তাহার একটীও আমরা চিনি না। ঐ সকল মৎস্য আমাদের দেশে পাওয়া যায় না, কারণ সমস্তই সামুদ্রিক মৎস্য এবং উহা সমুদ্র ভিন্ন অন্য কোথাও দেখা যায় না। আমাদের দেশের মত এখানে সকল রকমের শস্যই উৎপন্ন

হইয়া থাকে, বিশেষতঃ এখানে আউস ধান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আমরা আউসের চাউল ভক্ষণ করিলাম। অন্য কোনও প্রকারের চাউল দেখিলাম না। আমাদের দেশে যেমন নানা প্রকার বৃক্ষ, লতা এবং গো, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু দেখা যায়, এখানেও আমরা সে সমস্তই দেখিলাম; কিন্তু আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, আমরা এখানে একটীও পক্ষী দেখিতে পাইলাম না, তাই বলিয়া এখানে পক্ষী নাই এ কথা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ আমরা অল্প সময় ছিলাম, হয়তঃ আমাদের চক্ষে পড়ে নাই, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে এখানে পক্ষীর সংখ্যা খুব কম। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই কাক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে একটী কাক পর্য্যন্ত নাই। এই দেশের অধিবাসীগণ অধিকাংশই মুসলমান। ইহাদের ভাষা কতকটা চট্টগ্রামী ভাষার অনুরূপ। আমরা অনেক চেষ্টাতেও ইহাদের সমস্ত কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। এ দেশের লোক কৃষি-কার্য্যের দ্বারাই জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ধনশালী লোক এখানে নাই। সমুদ্রের নিকট বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইহা একটী প্রসিদ্ধ কারবারের স্থান।

কারবার দূরে থাকুক, সামান্য দুই একটী পণ্যশালাও এখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোনও পর্য্যটক বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিত সহসা এখানে আসিলে নানা বিষয়ে তাহার কষ্ট পাইতে হয়। কাননগু মহাশয় যদি আমাদিগকে আশ্রয় না দিতেন তবে আমাদিগকেও নানারূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। এখানে আমদানী রপ্তানীর কারবার নাই, কারণ এখানকার উৎপন্ন শস্যাদির দ্বারাই ইহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়। এ দেশের লোক সমস্তই অশিক্ষিত এবং এখানে কোনও বিদ্যালয় নাই; কিন্তু ইহাদের ভিতর এমন একটী গুণ আছে যাহা উচ্চ-শিক্ষিত লোকের মধ্যেও দেখা যায় না। ইহারা অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু এবং ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস; এমন কি, ইহারা প্রতি কথাতেই ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করে এবং প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফলের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার অভাব সত্বেও গীতার "যথা-নিযুক্তোস্মি তথা করোমি" এই কথাটীর উপর ইহাদের এরূপ নিষ্ঠা কে শিখাইল, ইহা চিন্তা করিয়া এবং ইহাদের ঔদার্য্য অবলোকন করিয়া আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিল এবং মনে মনে ভাবিলাম—লোকালয়ে

নানারূপ অশান্তিতে বাস করা অপেক্ষা এই নির্জ্জন দ্বীপে ইহাদের সহিত একত্রে বাস করিয়া ইহাদের সদ্‌গুণাবলী অনুকরণ ও ইহাদের ন্যায় একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ করিতে পারিলে জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইত এবং না জানি এ জীবন কতই সুখের হইত। অজ্ঞতা যে অনেক সময় সুখ এবং শান্তির কারণ ইহাদের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাদের অশেষ গুণ। ইহারা অত্যন্ত সরল ও মিষ্টভাষী এবং ইহারা ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত সাহসী এবং সমুদ্র-তীরে বাসহেতু সমুদ্র-যাত্রা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিয়া ইহারা এরূপ যাতায়াত ব্যাপারে আমাদের মত কোন প্রকার বিভীষিকা দেখে না। পুরুষের ন্যায় এ দেশের স্ত্রীলোকও অত্যন্ত সাহসী, কর্ম্মঠ এবং বলিষ্ঠ। এই দ্বীপে একটীও ব্রাহ্মণ নাই। এখানে যে কয়জন ভদ্রলোক আছেন তন্মধ্যে ডাক্তার বাবু ব্যতিরেকে সকলেই চট্টগ্রাম নিবাসী। ইঁহাদের নিকট হইতে স্থানীয় অধিবাসীদিগের উদার-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারিলাম, সে সমস্ত উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। আমাদের মোটামুটি

সমুদ্র দর্শন

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অশিক্ষিত লোককে কখনও ঘৃণার চক্ষে দেখা উচিত নয়, কারণ তাহারা অশিক্ষিত হইলেও সময় সময় তাহাদের নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ চরিত্র হইতে অনেক সার-গর্ভ উপদেশ পাওয়া যায়। আমরা পরদিন বেলা দশটার সময় আহারাদি করিয়া সকলের নিকট বিদায় লইলাম। সকলেই আমাদিগকে আরও দুই একদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ আমরা আসিতে বাধ্য হইলাম। আমরা দ্বীপের পূর্ব্বপারে উপনীত হইবার কিছুক্ষণ পর ষ্টীমার আসিল। ষ্টীমার ভিতরে থাকে ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবার তীর হইতে ষ্টীমারে পৌঁছিতে আমরা পূর্ব্বেই খুব ভাল একখানা নৌকা ঠিক করিয়া লইয়াছিলাম; এ জন্য আমাদের কোনও কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। কাননগু মহাশয়ের নিকট সমস্ত অবস্থা বলাতে তিনি আমাদের সহিত দুইজন পিয়ন দিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই ভাল নৌকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। আমরা নিরাপদে ষ্টীমারে উঠিলাম। সে দিন আমরা ভাটা ও অনুকূল বায়ুর সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে চট্টগ্রাম পৌঁছিলাম। আসিবার সময় সে দিনও ষ্টীমার বেশ হেলিয়া দুলিয়া এবং তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া আসিল

কিন্তু পূর্ব্বদিনের ন্যায় নহে। আসিবার সময় ষ্টীমারে অনেকের বমন হইল। আমরা ইহা বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলাম। ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় কিছু বমন-নিবারক ঔষধ সেবন করিয়া আসিয়াছিলাম, তাই ষ্টীমারে আমাদের কোনও কষ্ট পাইতে হয় নাই।

চট্টগ্রাম হইতে আমরা সেই রাত্রে চন্দ্রনাথ আসিলাম। স্থানটী সীতাকুণ্ড নামে পরিচিত। সীতাকুণ্ড হইতে চন্দ্রশেখর পর্ব্বত এক মাইল দূরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম হইতে ২৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এই পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ সমুদ্র হইতে প্রায় ৭৩৩ হাত উচ্চ। পর দিবস ২৭শে চৈত্র সোমবার প্রাতে আমরা পর্ব্বত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পাহাড়টী ঘুরিয়া আসিতে আমাদের দ্বিপ্রহর অতীত হইল। পর্ব্বতের শিখরদেশে ৺চন্দ্রনাথের পবিত্র মন্দির অবস্থিত। দুরারোহ চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অধিকাংশ স্থানে গাছ, লতা, পাতা এবং শুধু প্রস্তরের আশ্রয়ে উপরে উঠিতে হইলেও অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণও নিরাপদে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। বাবা চন্দ্রনাথের আলিন্দে বসিয়া সমুদ্র দেখা যায়, কিন্তু

তাহা বড়ই অস্পষ্ট, বোধ হয় সুদূরে সমুদ্র-গাত্র কুজ্ঝটীকারূপ বস্ত্র আবৃত করিয়া রহিয়াছে। যিনি বসন্ত-মাধুরীতে এই পর্ব্বত-শৃঙ্গে উঠিয়া ফল পুষ্প সুশোভিত শ্যামল তরুলতা ও উপত্যকাদি সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় অবশ্য একবার ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত হইয়াছে। আপনারা এ পর্ব্বত অনেকেই দেখিয়াছেন, কিম্বা এ পর্ব্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা অনেকের নিকট হইতেই অবগত আছেন, অতএব এ সম্বন্ধে পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক মনে করি।

আমরা এই পর্ব্বত দর্শনান্তর অন্যত্র যাইব মনন করিয়াছি, এমন সময় (যে জন্য আমরা এত তাড়াতাড়ি করিয়া সমস্ত জায়গা দেখিয়া আসিতেছি, পারিবারিক সেই রূপ কোন কারণ উপস্থিত হওয়ায়) সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। আমাদের ভ্রমণ আপাততঃ এখানেই শেষ হইল।

(সম্পূর্ণ)

অমৃতসর হইয়া কাশ্মীর পর্য্যন্ত পথের বর্ণনা ও দৃশ্যের ভাব বেশ সরল ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] এই পুস্তকে তাঁহাদের গন্তব্য পথের বিশেষ পরিচয় পাইবেন এবং তাঁহাদের কৌতূহল বৃদ্ধি হইবে। [illegible] বর্ণনা লিখিয়া [illegible] হইয়াছি। এই পুস্তকে [illegible] পথের চিত্র থাকিলে অতি সুন্দর হইত।

The Amrita Bazar Patrika.

21st March 1914.

UTTAR BHARAT BHRAMAN O SAMUDRA DARSAN.

The author of this book Babu Syama Kanta Ganguly who took a long trip in certain places in Northen India, has recorded in it of what he heard and saw. The style of the book is simple and attractive. We doubt not the book will prove an interesting and pleasant reading, containing as it does, accounts of many holy and otherwise noted places in Northern India. The poetical delineation of the scenes witnessed by the author tends to create a desire in a pleader to visit those places. At any rate, the book will prove as a guide to its readers. Price Re 1-8 annas only.

একত্রিংশ খণ্ড, [illegible] সংখ্যা। ফাল্গুন, [illegible]

নব্য ভারত।

উত্তর-ভারত-ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন। শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ১।০। এই সুন্দর পুস্তক খানি বিস্তৃত ভারত ইতিহাস সঙ্কলনের সময় বিশেষ কাজে আসিবে। দুঃখের বিষয়, এদেশে যাঁহারা ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তাঁহারা প্রায়ই ইংরাজির অনুবাদ করিতে ব্যস্ত হন, এদেশে কোথায় কোন্ ভাল পুস্তকে মৌলিক গবেষণা আছে, তাহার অনুসন্ধান করেন না। এইরূপ গবেষণা-পূর্ণ যে সকল পুস্তক এদেশে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পাঠ করিলে বড়ই আনন্দ হয় এবং মনে হয়, এদেশের ভবিষ্যৎ দিন দিন উজ্জ্বল হইতেছে। বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণ বদ্ধ পরিকর না হইলে কিরূপে ভাষা গঠিত হইবে? উত্তর ভারত ভ্রমণ পুস্তকখানি সর্ব্বত্র আদৃত হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বৃত্তান্ত লিপি বদ্ধ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। অধুনা দেশ ভ্রমণ ইচ্ছা অনেকেরই বলবতী হইয়াছে, বিশেষতঃ উত্তরাখণ্ড ভ্রমণ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন প্রকৃতই জীবনের পরম তৃপ্তিকর। এই গ্রন্থে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মধুর প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে যেমন আনন্দ লাভ হয়, বিদেশ ভ্রমণেচ্ছুক ব্যক্তিগণের পক্ষে বিদেশ গমনে ইহা তদপেক্ষা সুযোগ প্রদান করিবে বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষার বস্তু আছে। ছাপা ও বাঁধান সুন্দর হইয়াছে।

প্রবাসী।

মাঘ ১৩২০ সাল।

উত্তর ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন—

শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ১৮৩ ও ৩২ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাঁধা, ছাপা কাগজ চমৎকার, মূল্য দেড় টাকা।

এই পুস্তকে হরিদ্বার, পঞ্জাব, কাশ্মীর প্রভৃতি উত্তর ভারতের বহু প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণের বৃত্তান্ত, স্থানীয় ইতিহাস ও দ্রষ্টব্য বিষয়ের বর্ণনা এবং চট্টগ্রাম কক্স বাজার ও কুতুবদিয়া দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সমুদ্র যাত্রার বিবরণ ব্যক্তিগত যাত্রা বিবরণের সহিত বেশ সুন্দর

ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পর্যটক ও দেশ পরিচয় লাভেচ্ছু ব্যক্তি-গণের ইহা মনোরঞ্জক হইবে।

পুস্তকে একটী সূচী পত্রের ও চিত্রের অভাব আছে। প্রসিদ্ধ স্থান ও দর্শনীয় দৃশ্যের চিত্র দিলে বর্ণনা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

জন্মভূমি

১৩২০ সাল, অগ্রহায়ণ, ৮ম সংখ্যা।

উত্তর ভারত ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন। শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট, মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র। পুস্তকখানি একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থকার হিমালয় প্রভৃতি নানাপ্রদেশ ও তীর্থ স্থান সমূহ ভ্রমণ করিয়া আলোচ্য গ্রন্থে সরল ও হৃদয় গ্রাহী ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্ত সকল লিপি বদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থে রেলওয়ে, ষ্টীমারে, নৌকায়, গাড়ী ও একায় যাতায়াতের কোন্ স্থানের কিরূপ সুবিধা ও অসুবিধা তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। সুধী সমাজে গ্রন্থখানির সমাদর হইলে সুখী হইব।

ভারতবর্ষ।

ভাদ্র ১৩২০ সাল, ৩য় সংখ্যা।

উত্তর ভারত-ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন—শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। ভ্রমণ সম্বন্ধে কোন পুস্তক পাইলেই আমরা বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকি; বিশেষতঃ উত্তর ভারতে এমন দর্শনীয় স্থান ও পবিত্র তীর্থ আছে যে, তাহাদের কথা জানিলে বা পড়িলে, সত্য সত্যই কিছু ক্ষণের জন্য মনে ভাল ভাবের উদয় হয়। তাই আমরা এ পুস্তকখানি পরম সমাদরে পাঠ করিয়াছি। আমাদের মনে হয়, জম্বুর বিশেষ বিবরণ লিপি বদ্ধ করাই লেখক মহাশয়ের উদ্দেশ্য, তাই তিনি হরিদ্বার, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর প্রভৃতি স্থানের কথা অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। সে যাহাই হউক, এই পুস্তক খানি উত্তর ভারত ভ্রমণকারীদিগের পথের কথা অনেকটা বলিয়া দিবে।

[illegible]।

উত্তর-ভারত-ভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন—শ্রীশ্যামাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। পুস্তকখানির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই মনোজ্ঞ। লেখায় বেশ সরলতা ও ভাব-প্রবণতা আছে। গ্রন্থকারের আঁখি আছে, দর্শনীয় বিষয়গুলি বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পারেন,—লিখিবারও শক্তি আছে। পড়িতে পড়িতে বেশ একটু তন্ময়তা আসে। লেখা বেশ সরল ও হৃদয়গ্রাহী।

[illegible] যুবক। যুবক [illegible] নব্য যুবক দলের ন্যায় শ্যামাকান্ত বিলাস বিভ্রমে মত্ত হইয়া সখের ভ্রমণে বাহির হ'ন নাই বা কেবল মাত্র প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করেন নাই, অধিকন্তু তিনি স্থান মাহাত্ম্য বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহা প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তকে বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছেন, এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন। সেন মহাশয় ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরাও সমর্থন করি। লেখক [illegible] করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন [illegible] যে স্থানে গিয়াছিলেন তাহার সকলই দেব দেবীর মাহাত্ম্য [illegible] করিয়া বিস্ময় পুলকে আত্মহারা হইয়াছেন। স্থানের ভৌগলিক বর্ণনা, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা তৎসঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির সামঞ্জস্যে হৃদয়োদ্ভূত দেব দেবীর মাহাত্ম্য ও করুণার অনুভূতি বর্ণনা বড়ই সুন্দর বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। মনের ভাব লেখায় ফুটানো সহজ নহে, বিশেষ কৃতিত্ব থাকা দরকার। শ্যামাকান্তের তাহা আছে। এই পুস্তক একেবারে ভ্রম প্রমাদ শূন্য এমন কথা আমরা বলি না। মাঝে মাঝে ভাষার জটিলতা ও শব্দ বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। প্রথম লেখকের পক্ষে এরূপ সামান্য ভ্রম প্রমাদ মার্জনীয়।

আমরা আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এই সব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইবে। শ্যামাকান্তের শারীরিক [illegible]। যৌবন [illegible]

বিচলিত না হইয়া সে যে মহান্ উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রাখিয়া মতি গতির পরিচালনা করিয়াছে, তাহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। শ্রীমানের নিকট আমরা অনেক আশা করি। তাহার সৎকার্য্যে মতি থাকুক, তাহার পরগা সদুদ্দেশ্যে ব্যয়িত হউক, সে দেশের ও দশের কার্য্যে লিপ্ত হইয়া জীবন ধন্য করুক। ইহাই আমাদের আশীর্ব্বাদ।

এই পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। মূল্য ।॥৹ টাকা মাত্র। পুস্তকের কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের দিকে দৃষ্টি করিলে মূল্য বেশী বলিয়া মনে হয় না। পুস্তকখানা শ্যাম বাজার ৮ নং শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, "তারা প্রেসে" বিপিনবিহারী ইন্দ্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।